বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলের ভাগন ঃ
সমীক্ষায় আওয়ামী লীগ

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এম, ফিল, ডিগ্রীর জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে পেশকৃত অভিসন্দর্ভ, সন- ১৯৮৮ ইং ।

তত্ত্বাবধায়ক

384592

ইয়াসমিন আহমেদ
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা ।

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

M.Phil.

GIFT

384592

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Library
384592

*Dhaka University Institutional Repository*

# বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলের ভাংগন :
# সমীক্ষায় আওয়ামী লীগ

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এম, ফিল, ডিগ্রীর জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে পেশকৃত অভিসন্দর্ভ, সন - ১৯৮৮ ইং ।

ইয়াসমিন আহমেদ
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

## আমার কথা

আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক প্রফেসর এমাজউদ্দীন আহমদের তত্ত্বাবধানে আমি এই গবেষণা কর্মটি শুরু করি । তিনি আমার চিন্তা ধারনা ও বিশ্লেষণের ব্যাপারে সর্বদা সহায়তা করেছেন । তাঁর অপরিসীম যত্ন ও সক্রিয় সহযোগিতা ব্যতীত এই গবেষণাটি শেষ করা আমার পক্ষে সম্ভব হতো না । সেজন্য তাঁর প্রতি রইলো আমার অশেষ শ্রদ্ধা ।

রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় প্রধান প্রফেসর শামসুল হুদা হারুনের কাছ থেকে আমি বিভিন্ন সময়ে মূল্যবান পরামর্শ পেয়েছি সেজন্য তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ ।

স্বাধীনতা যুদ্ধ ইতিহাস প্রকল্পের পরিচালক জনাব এম,আর, আখতার, গবেষক শাহ আহমদ রেজা ও ত্রিদীব দস্তিদার আমাকে অনেক মূল্যবান পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা ব্যবহারের সুযোগ দিয়েছেন । আমি সংসদ ভবন গ্রন্থাগারের প্রধান জনাব তৌফিক হাসানের কাছ থেকেও অনেক সাহায্য পেয়েছি । সুতরাং তাদের সহযোগিতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দকে তাদের সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ।

সবশেষে আমার অভিসন্দর্ভ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অতি যত্নসহকারে টাইপ করবার জন্য মোঃ বজলুর রহমানের প্রতি আমার ধন্যবাদ রইলো ।

384592

ইয়াসমিন আহমেদ
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা
৩রা অক্টোবর, ১৯৮৮ইং ।

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

## সূচী পত্র


| | | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| ১। | ভূমিকা ... ... | ১-১০ |
| ২। | প্রথম অধ্যায় ... ... | ১১-২৫ |
| ৩। | দ্বিতীয় অধ্যায় ... ... | ২৬-৫৪ |
| ৪। | তৃতীয় অধ্যায় ... ... | ৫৫-৭৭ |
| ৫। | চতুর্থ অধ্যায় ... ... | ৭৮-৯৬ |
| ৬। | পঞ্চম অধ্যায় ... ... | ৯৭-১০৫ |
| ৭। | গ্রন্থপঞ্জী ... ... | ১০৬-১১৪ |


384592

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

## ভূমিকা

যে সকল সামাজিক ও রাজনৈতিক আদর্শ মানব সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করেছে, গণতন্ত্র তাদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়। গণতন্ত্র শুধু একটি শাসন ব্যবস্থা তাই নয়, এটি একটি সমাজ ব্যবস্থা এবং একটি জীবন ব্যবস্থাও বটে। আর এই গণতন্ত্রের প্রাণকেন্দ্র হচ্ছে রাজনৈতিক দল। অবশ্যই রাজনৈতিক দল দলীয় প্রতিনিধিত্বশীল সরকারের এক অপরিহার্য অংগ।

প্রফেসর এডমান্ড বার্কের মতে, "কতকগুলি লোক যখন তাদের সমবেত চেষ্টার দ্বারা সার্বজনীন স্বার্থ অর্জনের উদ্দেশ্যে কতগুলি নীতি সম্বন্ধে একমত হয়ে সংঘবদ্ধ হয়, তখন রাজনৈতিক দল গঠিত হয়"।[১] অপরদিকে আর,এস, ম্যাকাইভার এর মতে,"রাজনৈতিক দল কোন নীতির সমর্থনে সংগঠিত সংঘ বিশেষ, যা নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সরকার পরিচালনায় প্রয়াসী হয়"।[২] আবার যোশেফ সুমপিটার রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে উল্লেখ করেন, "রাজনৈতিক দল হচ্ছে একটি সংঘ যা ক্ষমতা দখল ও তাতে টিকে থাকবার প্রয়াসে কার্যরত থাকে।"[৩] মরিস দুভারজার বলেন, "দল হচ্ছে নির্দিষ্ট কাঠামো ভিত্তিক একটা সম্প্রদায়"।[৪]

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলো থেকে রাজনৈতিক দলের বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। এগুলি হলো (১) ঐক্যবদ্ধ জন সমষ্টি (২) সাংগঠনিক কাঠামো ও শৃঙ্খলা (৩) স্বার্থ জ্ঞাপন ও স্বার্থ একত্রীকরণ (৪) নীতি ও আদর্শ (৫) ক্ষমতা দখল ও তা টিকিয়ে রাখা। এ ছাড়াও মত ভিন্নতা, বিরুদ্ধতা, রেষারেষি প্রমুখ বৈশিষ্ট্য দলে থাকতে পারে। আর এই মত ভিন্নতা বা বিরুদ্ধতা যদি মাত্রাধিক শক্তি নিয়ে বিরাজ করে বা ক্রিয়াশীল হয় তখনই উপদলীয় কোন্দলের রাজনীতির সূত্রপাত ঘটে। কোন দলের ক্ষেত্রে বা রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে দলভাংগার রাজনীতির শুরু হয় এভাবে। কোন্দল প্রথমে থাকে দলের অভ্যন্তরে এবং পরবর্তীতে মাত্রাধিক তীব্রতা দেখা দিলে এটা দল বহিঃস্থ হয়ে পড়ে। তখন দলীয় আনুগত্যের বদল হয় এবং দলে ভাংগন দেখা দেয়।[৫]

রাজনীতির এই বিশেষ দিক সম্পর্কেই এই গবেষণা। আমার গবেষণার বিষয়বস্তু "বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলে ভাংগন : সমীক্ষায় আওয়ামী লীগ"। বিষয়টিকে নির্ভুল, সঠিক এবং তত্ত্ব ও তথ্য দ্বারা যুক্তি সংগত করে তুলবার জন্য আমি মূল বিষয়কে তিনটি ভাগে ভাগ করে

---

১। Edmund Burke - Selected works ed. with introduction and notes by E.J.Payne,1877, P-16

২। R.M.MacIver - The web of government. The Free press, A Division of Macmillan publishing Co.New York,1965,London.

৩। J.Schumpeter - Social Scientist by Seymour E. Harris, Cambridge,Harvard university Press, 1951, P-30

৪। M.Duverger - Political Parties, Methuen & Co. Ltd. 1951,P-10

৫। G.David Garson - Group Theories in politics, Vol-61,Sage Publication, Beverly Hills, London, 1969 ,P - 96

Dhaka University Institutional Repository



নিয়েছি । প্রথমতঃ দল ভাংগনের তাত্ত্বিক আলোচনা ও বিশ্লেষণ । দ্বিতীয়ঃ জরীপ ও সমীক্ষাকেন্দ্র হিসেবে আওয়ামী লীগের বিস্তারিত পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ এবং তৃতীয়তঃ বাংলাদেশের রাজনীতিতে দল ভাংগন ও এর প্রবনতার ফলাফল । সর্বশেষে নিজের অভিমত লিপিবদ্ধ করেছি ।

## গবেষণার লক্ষ্য ও গুরুত্ব(Objectives & importance)

আমার অভিসন্দর্ভের মূল লক্ষ্য হোল তাত্ত্বিক বিশ্লেষনের আলোকে বাংলাদেশে দলভাংগনের কারণ খুঁজে বের করা । অর্থাৎ রাজনীতিতে কোন্ পরিস্থিতিতে এবং কেন কোন্দল ও অস্থিরতা দলে ভাংগনের দিকে এগিয়ে দিয়ে যায় । তা ছাড়া দল ভাংগনের প্রবনতাই বা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে । কেন ? এই প্রসংগে এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, আজ আমাদের প্রতিটি রাজনৈতিক দলই ভাংগনের সম্মুখীন হচ্ছে ।

স্বাধীনতা যুদ্ধ ও বাংলাদেশের তৎকালীন সরকারের ভূমিকার পর্যালোচনায় বামপন্থীরা বিভিন্ন দৃষ্টি ভংগীতে ভিন্ন মতবাদ ও ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন । ফলে তাদের মধ্যেই প্রথম শুরু হয় কোন্দল ও ভাংগনের প্রক্রিয়া ।

পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিষ্ট পার্টির সুধেন্দু দস্তিদার ও মোহাম্মদ তোয়াহা পূব বাংলার সাম্যবাদী দল গঠন করেন । মতিন-আলা উদ্দিনের নেতৃত্বে পূব বাংলার কমিউনিষ্ট পার্টি পাবনার আত্রাই নামক স্থানে তৎকালীন রক্ষী বাহিনীর সাথে সশস্ত্র সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে ব্যাপক হত্যা ও গ্রেফতারের ফলে প্রায় নির্মূল হয়ে পড়ে । দেবেন সিকদার ও আবুল বাশার বাংলার কমিউনিষ্ট পার্টি গঠন করেন এবং পরে 'জাতীয় গণমুক্তি ইউনিয়ন' গঠন করেন । অপরদিকে জাফর, মেনন, অমলসেন, নাসিম আলী মিলে বাহাত্তর সালে বাংলাদেশের লেনিনবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি গঠন করেন । কাজী জাফর এ সময়ে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির ( ভাসানী) সাধারণ সম্পাদক ছিলেন । পরবর্তীকালে ন্যাপের সাথে মতবিরোধের ফলে তাঁরা ইউনাইটেড পিপলস পার্টি নামে নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করেন । কিন্তু কাজী জাফর ও হালিম চৌধুরী জিয়া সরকারের মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করলে হায়দার আকবর খান রনো, রাশেদ খান মেনন, নাসিম আলী ইউপিপি থেকে বেরিয়ে ইউপিপি ( সাদেক) গড়ে তোলেন ।

১৯৭৫ সনের পর ভাসানী ন্যাপের অভ্যন্তরে কোন্দল মারাত্মক আকার ধারন করে । দলের ভিতরে কাম্য পদ লাভের জন্য কোন্দল এবং জিয়া সরকারের মন্ত্রীত্ব ও সুযোগ লাভের কামনা এ দলে বারংবার ভাংগন এবং ভাংগন থেকে গড়া দলে আবারো ভাংগন ডেকে আনে । ভাসানী নিজেই ন্যাপের দিকে দৃষ্টি না রেখে তাঁর জীবন এর একেবারে শেষ পর্যায়ে 'খোদাই খিদমতগার' নামে একটি ধর্মীয় সংগঠন গড়ে তোলেন ।

Dhaka University Institutional Repository



বাংলাদেশের রাজনীতিতে দল ক্যারিজমা ও ব্যক্তি নেতৃত্ব কেন্দ্রিক হওয়ায় এবং দলে সুদৃঢ় সাংগঠনিক কাঠামো ও শৃংখলা এবং আদর্শের ভিত্তির অভাবে দলের অভ্যন্তরে উপ দলীয় দ্বন্দ্ব - কোন্দল এবং পরিনতিতে নেতার মৃত্যুতে বা অনুপস্থিতিতে দলের এক দফা বা কয়েক দফা ভাংগনের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হচ্ছে ভাসানী ন্যাপ, জিয়াউর রহমানের বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল এবং ওসমানীর জাতীয় জনতা পার্টি ।

জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পর বি এন পিতে ভাংগন আসে তিনভাবে । বিএনপি (সাত্তার) , বিএনপি ( হুদা- মতিন), বিএনপি (দুদু - মিলু ) এবং পরবর্তীতে দুদু ও মিলু আবার পৃথক হয়ে যায় ।

জাতীয় জনতা পার্টির ঐক্যের ভিত্তিই ছিল ওসমানীর একক ব্যক্তিত্ব । তা সত্ত্বেও এদলের ফেরদৌস আহমদ কোরায়েশী পৃথক জনতা পার্টি (কোরায়েশী ) গঠন করেছিলেন । ওসমানীর মৃত্যুর পর জাতীয় জনতা পার্টি ( মোশাররফ ) এবং জাতীয় জনতা পার্টি (ওয়াদুদ) এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে ।

আমরা যদি মুসলীম লীগের গত ৩৯ বছরের ভাংগনের সংক্ষিপ্তসম ইতিহাস নেই তাহলে দেখবো নেতৃত্বের কোন্দল , দলীয় শৃংখলার অভাব, ক্ষমতার মোহ, পদলাভ, সাংগঠনিক কাঠামোর অভাব এবং অনবিচ্ছিন্ন রাজনীতি মুসলীম লীগকে অসংখ্যবার ভাংগনের সম্মুখীন করেছে । প্রথমে মুসলীম লীগ ভেংগে হয়েছে আওয়ামী লীগ অতঃপর কাইয়ুম মুসলীম লীগ, কাউন্সিল মুসলীম লীগ ও কনভেনশন মুসলীম লীগ । বাংলাদেশ হবার পর শাহ আজিজের নেতৃত্বে মুসলীম লীগের একাংশ জিয়ার জাতীয়তাবাদী দলে যোগ দেয় । অতঃপর অংশগুলোর মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ মুসলীম লীগ ( সিদ্দিকী ), অধ্যক্ষ রইস উদ্দীনের 'নিখিল বাংলাদেশ মুসলিম লীগ ( টি,আলী ) বাংলাদেশ মুসলিম লীগ ( আবুল আলী ), নিখিল বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (ফয়েজ), বাংলাদেশ মুসলীম লীগ (সবুর ) ।

স্বাধীনতাত্তোর কালে নিষিদ্ধ ঘোষিত জামাতে ইসলামী, নেজামে ইসলামী , পিডিপি ও খেলাফতে রব্বানী পার্টির যৌথ উদ্যোগে ১৯৭৬ সালে গঠিত হয় ইসলামীক ডেমোক্রেটিক লীগ কিন্তু ১৯৭৭ সালে এই দল দুইভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে । এক অংশের নেতৃত্ব দেন জামাতে ইসলামীর তৎকালীন আমীর মাওলানা আবদুর রহিম ও অপর অংশের নেতৃত্ব দেন নেজামেইসলামে

Dhaka University Institutional Repository



নেতা সিদ্দিক আহমদ । ১৯৭৯ সনের শেষ দিকে আই,ডি,এল (রহিম) ও জামাতের মধ্যে রাজনৈতিক কর্মসূচীর প্রশ্নে মতবিরোধ দেখা দেয় । ফলে আই,ডি,এল, জামাতের সংগে সম্পর্ক ছিন্ন করে । বর্তমানে জামাতে ইসলাম সহ বাংলাদেশে মোট ৬৬ টি ইসলাম পন্থী দল গড়ে উঠেছে ।[৬]

দেখা যায়, শ্রমিকদের সংগে কোনরূপ সম্পর্ক না রেখে শ্রমিক দল নামে তিনটি রাজনৈতিক দল ক্রিয়ারত রয়েছে, যেমন, মাওলানা আবদুল মতিনের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ লেবার পার্টি (মতিন) । এই দল থেকে বেরিয়ে গিয়ে গোলাম মোস্তফা খানের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ লেবার পার্টি (মোস্তফা), আর ডাঃ শাহাবুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল লেবার পার্টির পরে গঠিত হয়েছে ।

১৯৭২ সনে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের বক্তব্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল ১৯৮০ সনে দলের ভবিষ্যত কর্মসূচী ও আদর্শ নির্ধারনে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয় এবং এর একটি গ্রুপ "বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল" (বাসদ) নামে নতুন দল গঠন করে । পরবর্তীতে জাসদ পুনরায় ভাংগনের সম্মুখীন হয় এবং এর এক অংশের নেতৃত্ব দেন শাহজাহান সিরাজ ও মীর্জা সুলতান রাজা এবং অন্য অংশে থাকেন আ,স,ম রব এবং চিত্তরঞ্জন গুহ । অপর দিকে '৮৩ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর বাসদ দ্বিধাবিভক্ত হয় ।

মাওলানা ভাসানীর মৃত্যুর পর ন্যা (ভাসানী) চারভাগে বিভক্ত হয় । ন্যাপ (খালেক), ন্যাপ (নাসের ভাসানী), ন্যাপ (নুরুর রহমান) এবং ন্যাপ (সেলিনা) ।

সুতরাং বলা যায় আজ আমাদের প্রতিটি রাজনৈতিক দল খন্ডে বিখন্ডে বিভক্ত হয়ে পড়েছে । আমি তাই মনে করি আমার গবেষনার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । কারন আমাদের রাজনীতির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে অভ্যন্তরীন দলীয় মতানৈক্য, কোন্দল ও বিভক্তি । বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ঘটলেও আমাদের দলভাঙ্গার প্রবনতা রোধ হয়নি । এই পরিস্থিতির সঠিক বিশ্লেষণ দরকার ।

---

৬। প্রবন্ধ "ইসলামী দল সমূহের অর্ন্তবিরোধ", সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ঢাকা, ৩০শে নভেম্বর-১৯৮৪

Dhaka University Institutional Repository



তাছাড়া দলভাংগার রাজনীতির উপর তেমন কোন পর্যালোচনামূলক লেখা বা গবেষনা কর্ম হয়নি । সুতরাং এ ধরনের গবেষনার গুরুত্ব অত্যধিক ।

## গবেষনা ক্ষেত্র ( Study Area)

একটি সাপ্তাহিক ম্যাগজিনে প্রকাশিত হয়েছিল যে বর্তমানে বাংলাদেশ রাজনৈতিক দলের সংখ্যা হচ্ছে প্রায় ১৭০ টি ।[৭] এর মধ্যে কেবলমাত্র ইসলামপন্থী দলের সংখ্যা হচ্ছে ৬৬টি । বস্তুত দলভাংগন বাংলাদেশের রাজনীতিতে এক ঐতিহ্যে পরিনত হয়েছে । দলভাংগনের কারন খুঁজতে গিয়ে গবেষনার সুবিধার্থে আওয়ামী লীগের উপর ব্যাপকভাবে কাজ করেছি । কারন আওয়ামী লীগ দলটি বাংলাদেশের অন্যতম পুরোনো একটি রাজনৈতিক দল । ১৯৪৯ সনে আওয়ামী মুসলীম লীগ নাম নিয়ে জন্মলাভের পর থেকে বহু চড়াই উৎরাই পার হয়ে দলটি এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের রাজনীতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে । অবশ্য এর মধ্যে দলটি ভাঙনের সম্মুখীন হয়েছে বেশ কয়েকবার ।

আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালী জাতীয়তাবাদের প্রতীক হিসেবে জনগনের কাছে সমাদৃত । তিনি বাঙালী জাতিকে পৃথক জাতি হিসেবে বিশ্বের দরবারে পরিচয় করিয়ে দেন ।

তাছাড়া আওয়ামী লীগের নেতৃত্বেই বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আজ বিশ্বের মানচিত্রে স্থান করে নিতে পেরেছে ।

সুতরাং এই পুরাতন ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক দলটিকে আমি আমার গবেষনার জরীপ ক্ষেত্র হিসেবে বাছাই করেছি ।

১৯৪৯ সনের জুন মাসে ঢাকার ২৫০ নম্বর মোঘলটুলীতে এক কর্মী শিবিরে শওকত আলী একটি সম্মেলনের আহবান জানান । সম্মেলনের সভাপতি ও সাধারন সম্পাদক নির্বাচিত যথাক্রমে মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ও ইয়ার মোহাম্মদ খান । ২৩ ও ২৪ জুন'

---

৭। সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ৭ম বর্ষ, ২৬ সংখ্যা, ১লা ডিসেম্বর ১৯৭৮ প্রচ্ছদ প্রবন্ধ- ভাংগা গড়ার রাজনীতি ।

Dhaka University Institutional Repository


সনে কর্মী সম্মেলনের পর গঠিত হয় আওয়ামী মুসলিম লীগ । সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক খসড়া সংবিধান পাঠ করেন । ১৯৫৫ সনের ১৪ নভেম্বর আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে বামপন্থী নেতাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সভাপতি ভাসানীর উদ্যোগে আওয়ামী মুসলীম লীগ থেকে 'মুসলীম' শব্দটি বাদ দেয়া হয় । তখন থেকে অসম্প্রদায়িক দল হিসেবে আওয়ামী লীগ তার যাত্রা শুরু করে । ১৯৫৪ সনে যুক্ত ফ্রন্টের বৃহত্তম শরীক দল হিসাবে আওয়ামী লীগ নির্বাচনে যোগ দেয় ।

১৯৫৭ সনে দলটিতে প্রথম ভাংগন দেখা দেয় । উক্ত বছরের জুন মাসে কাগমারীতে মাওলানা ভাসানী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দ্দীর বৈদেশিক নীতির তীব্রভাবে সমালোচনা করেন এবং তার প্রতি অনাস্থা প্রস্তাব আনেন । অতঃপর মাওলানা ভাসানী তার সমর্থকদের নিয়ে ১৯৫৭ সনের ২৭ জুলাই জাতীয় আওয়ামী পার্টি গঠন করেন ।

১৯৫৮ সনে সামরিক আইন জারী হলে রাজনৈতিক দলগুলোর কার্যএম নিষিদ্ধ হয় । ১৯৬২ সনে রাজনৈতিক কার্যএম পরিচালনার অনুমতি লাভের পর আওয়ামী লীগ পুনরুজ্জীবিত হয় । সোহরাওয়ার্দ্দীর মৃত্যুর পর ১৯৬৪ সালের জানুয়ারী থেকে দলের নেতৃত্বের ভার গ্রহণ করেন শেখ মুজিবর রহমান ।

১৯৬৫ সনে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সম্মিলিত বিরোধী জোটের শরীক দল হিসাবে আওয়ামী লীগ নির্বাচনে অংশ নেয় ।

১৯৬৬ সনের গোড়ার দিকে আওয়ামী লীগ তার ঐতিহাসিক ছয় দফা কর্মসূচী গ্রহণ করে

১৯৬৭ সনে আমেনা বেগম ও আতাউর রহমান আওয়ামী লীগ থেকে বের হয়ে জাতীয় লীগ গঠন করেন । দ্বিতীয় বারের মত বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয় আওয়ামী লীগ ।

১৯৬৮-৬৯ সনে গণঅভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে গঠিত হয় ( Democratic Action Committee) এবং ছয় দফার ভিত্তিতে গড়ে উঠে দুর্বার আন্দোলন ।

১৯৭০ সনের জাতীয় ভিত্তিক নির্বাচনে আওয়ামী লীগ অভূত পূর্ব বিজয় অর্জন করে ।

১৯৭১ সনে ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবসের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের সৃষ্টি হলে আওয়ামী লীগ সরকারী দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে ।

Dhaka University Institutional Repository



১৯৭৫ সনের ২৫শে জানুয়ারী সংবিধান সংশোধনির মাধ্যমে গঠিত হয় বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল)

১৯৭৬ সনে রাজনৈতিক দলবিধি '৭৬ এর মাধ্যমে আওয়ামী লীগ কার্যএম শুরু করলে দলটিতে ভাংগন দেখা দেয় । ১৯৭৬ সনে গঠিত হয় 'জাতীয় জনতা পার্টি' আতাউল গনি ওসমানীর নেতৃত্বে । একই বৎসরে মাওলানা তর্কবাগীসের নেতৃত্বে 'গণ আজাদী লীগ' গঠিত হয় । অপরদিকে খন্দকার মোশতাকের নেতৃত্বে গড়ে উঠে 'ডেমোক্রেটিক লীগ' ।

১৯৭৮ সনে আওয়ামী লীগ পুনরায় ভাংগনের সম্মুখীন হয় । মিজানুর রহমান চৌধুরীর নেতৃত্বে একটি গ্রুপ পৃথক আওয়ামী লীগ গঠন করে । অপর গ্রুপটি আব্দুল মালেক উকিলের নেতৃত্বাধীন রয়ে যায় ।

১৯৮৩ সনে আওয়ামী লীগের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভাংগন দেখা দেয় । আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে পুনরায় ভাংগনের সম্মুখীন হয় আওয়ামী লীগ । ১৯৮৩ সনে রাজ্জাক গঠন করেন বাকশাল । অপরদিকে মূল আওয়ামী লীগ হাসিনার নেতৃত্বে পরিচালিত হয় ।

## গবেষণা পদ্ধতি (Methodology)

আমরা গবেষণার বিষয় বস্তুকে নির্ভুল, সঠিক এবং তত্ত্ব ও তথ্য দ্বারা উপস্থাপিত করার জন্য আমি নিম্নোক্ত ভাবে এগিয়ে গিয়েছি । আমি আমার গবেষণায় ঐতিহাসিক পদ্ধতি (Historical Method) অনুসরন করেছি । আমি সাহায্য গ্রহণ করেছি প্রাথমিক ক্ষেত্রের (Primary Stdy ) উৎস সমূহ যেমন আওয়ামী লীগের বিভিন্ন দলিল পত্র (Documents) থেকে এবং অপরাপর মাধ্যমিক (Secondary) উৎস যেমন বিভিন্ন লেখা থেকে । এ ছাড়া সংবাদ পত্র, রিপোর্ট, সংসদ কার্যএম, সরকারী প্রকাশনা এবং সরকারী দলিল থেকেও আমি প্রয়োজনীয় তথ্যবলী সংগ্রহ করেছি ।

আমি আওয়ামী লীগের প্রায় ৪০ জন প্রবীণ ও নবীন নেতৃবৃন্দের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছি । এ জন্যে আমি সুনির্দিষ্ট একটি প্রশ্নমালা বহি (Questionnaire) প্রনয়ন করে প্রয়োগ করেছি । সাক্ষাৎকার গ্রহণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সংগৃহীত তথ্যবলীর যাচাই করা এবং একই সংগে আওয়ামী লীগ সদস্যদের আর্থ সামাজিক ও শিক্ষাগত পট-ভূমিকাসম্পর্কে অবগত হওয়া ।

Dhaka University Institutional Repository



তাছাড়া দলত্যাগে যাবার কারণ হিসাবে তাঁরা কি ভাবেন এবং তাদের দৃষ্টি ভংগী জানবার জন্য ও প্রশ্নমালা নথির প্রয়োজন ছিল । একই সংগে আমি দলটির উপর ব্যাপক জরীপ চালিয়ে তথ্যাদি সংগ্রহ করেছি ।

পরিশেষে সংগৃহীত উপাত্ত সমূহ বিন্যাস ও বিশ্লেষন করতে পরিসংখ্যান মূলক বিশ্লেষন পদ্ধতি ( Statistical Analytical Method ), বিশেষ করে ঘটনা ভিত্তিক বিশ্লেষন পদ্ধতি ( Case Analysis Method ) অনুসরণ করেছি ।

সুতরাং আমার গবেষণা কর্মের প্রয়োজনীয় তথ্যের উৎস সমূহ হচ্ছে :-

১। গবেষণার জন্য প্রাসংগিক ও পার্শ্বিক তত্ত্বসমূহের অনুধাবন ও সংশ্লেষন ।

২। বাংলাদেশের বিরাজমান আর্থ-সামাজিক রাজনীতিক ব্যবস্থার দিকে দৃষ্টি রেখে উপাত্ত সংগ্রহ ।

৩। আওয়ামী লীগের সংগে যুক্ত রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ, দলীয় নেতৃবর্গ ও রাজনৈতিক কর্মীদের সংগে গৃহীত সাক্ষাৎকার সমূহের তথ্য সাহায্য ও বিশ্লেষন ।

৪। রাজনৈতিক দল সমূহের গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক, রচনাবলী ও বিভিন্ন মূল্যবান দলিলপত্র

৫। গবেষণার সংগে সম্পর্ক যুক্ত বিভিন্ন সময়ের পত্র পত্রিকা ও সরকারী ( Proceedings ) এবং

৬। খ্যাতনামা রাষ্ট্র বিজ্ঞানীদের রচনা সমূহ, পুস্তকাদি ও তাদের বিশ্লেষনাত্মক মূল্যবান প্রবন্ধ সমূহ ।

## অধ্যায়করণ ( Chapterization )

উল্লেখিত পদ্ধতি সমূহ সুসংবদ্ধভাবে (Systematically) পরীক্ষা নীরিক্ষা করে সঠিক ভাবে বিন্যাস করবার জন্য আমার সমগ্র গবেষণা কর্মটিকে দ্বিযুক্ত অধ্যায়ে বিভক্ত করেছি ।

এই নিবন্ধের বিভিন্ন পরিচ্ছেদে বর্ণিত বিষয়ের একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা নিম্নে লিপিবদ্ধ করতে প্রয়াস করেছি ।

Dhaka University Institutional Repository


১। প্রথম অধ্যায় : এই অধ্যায়ে আমি আলোচনা করেছি সার্বিক ভাবে রাজনৈতিক দলগুলি কেন ভেংগে যায় তার তত্ত্বগত ধারনা সম্পর্কে । অর্থাৎ রাজনৈতিক দলগুলিতে কি কারণে কোন্দলের সৃষ্টি হয় এবং দলগুলি এমনাগত কেন ভাংগনের সম্মুখীন হয় । এক্ষেত্রে খ্যাতনামা রাষ্ট্র বিজ্ঞানীদের লিখিত বিভিন্ন গ্রন্থ, প্রবন্ধ, গবেষণা মুলক পত্রিকার সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে । একই সংগে প্রয়োজন অনুসারে দল ভাংগার কারণ হিসাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের অভিমত ও তুলে ধরেছি ।

২। দ্বিতীয় অধ্যায় : এই অধ্যায়ে আমি গবেষণা কর্মের জন্য নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগকে বেছে নিয়ে কাজ করেছি ।গবেষণার এ পর্যায়ে আমি একটি সুর্নিদিষ্ট পদ্ধতিতে এগিয়ে গিয়েছি । আওয়ামী লীগ সম্পর্কে গবেষণার প্রথম সুত্রে এই দলটির অতীত ইতিহাসের ( Past Record ) সাহায্য নিয়ে আওয়ামী লীগের উৎপত্তির পটভূমিকা, প্রতিষ্ঠা, লক্ষ্য, কর্মসুচী, আদর্শ, প্রকৃতি ও স্বরূপ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি ।

৩। তৃতীয় অধ্যায় : এই অধ্যায়ে দলীয় দলিল পত্র (Past documents) পত্র পত্রিকা , পুস্তকাদি এবং বিভিন্ন প্রবন্ধের সাহায্য গ্রহণ করে কারণ খুঁজে বের করতে চেষ্টা করেছি যে, আওয়ামী লীগ দলটি জন্মলগ্ন থেকে অর্থাৎ ১৯৪৯ সন থেকে বর্তমান সময় (১৯৮৭) সন পর্যন্ত কতবার, কখন এবং কি কারণে অভ্যন্তরীন কোন্দলের সম্মুখীন হয়েছে ও চুড়ান্ত পর্যায়ে ভেংগে গেছে । একই সংগে তুলে ধরেছি দলের ভিতর অন্তদ্বন্দ্ব কখন, কোন পরিস্থিতিতে তীব্র আকার ধারন করে দলের ভাংগনকে তরান্বিত করেছে ।

৪। চতুর্থ অধ্যায় : এই অধ্যায়ে আমি আওয়ামী লীগের সংগে জড়িত নেতা কর্মী ও সদস্যদের মধ্যে থেকে ৪০ জন সদস্যকে বাছাই করে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছি । এই পর্যায়ে আমি একটি প্রশ্নমালা নথি প্রনয়ন করেছি । বাছাই কৃত সদস্যরা এই প্রশ্নমালার উত্তর দানে স্বীয় মতামত প্রদান করেছেন । আমি প্রাপ্ত উপাত্তগুলি বিশ্লেষন করে চুড়ান্ত ফলাফল লাভ করেছি । অতঃপর এই ফলাফল পরিসংখ্যানের মাধ্যমে শতকরা হার বের করেছি এবং তা সরনীর সাহায্যে তুলেধরে বিশ্লেষন করেছি ।

Dhaka University Institutional Repository



সাক্ষাৎকার গ্রহণের ক্ষেত্রে আমি যে মোট ৪০ জন সদস্য বাছাই করেছি তাদের বয়স রাজনীতিতে অভিজ্ঞতা, দলে পদমর্যাদা ভিত্তিক স্থান এবং রাজধানী ভিত্তিক, মফস্বল ভিত্তিক ও গ্রামভিত্তিক সদস্য এই ভাবে ভাগ করে নিয়েছি ।

৫। পঞ্চম অধ্যায় : এই অধ্যায়টি হচ্ছে উপসংহার । এখানে আমি বলার চেষ্টা করেছি যে, আমাদের মত দরিদ্র, উন্নয়নশীল একটি রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলগুলি যে ভাবে অহরহ ভেংগে যাচ্ছে তাতে আমাদের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বারবার বিঘ্নিত হচ্ছে । একই সংগে আজ আমাদের গণতন্ত্র বিরাট হুমকীর সম্মুখীন ।

আওয়ামী লীগের উপর ব্যাপক জরীপ চালাবার পর এই অধ্যায়ে আমি দলভাংগনের কারণ গুলির উপর মতামত দিতে চেষ্টা করেছি ।

পরিশেষে মন্তব্য করতে চেষ্টা করেছি যে, এই ধরনের পরিস্থিতি আমাদের রাজনীতিতে কি প্রতিক্রিয়া বা প্রভাব রাখতে পারে এবং এর ফলাফল কি হতে পারে ।

এই গবেষণা কর্মটির সমাপ্তি পর্যন্ত উপরোল্লিখিত পদ্ধতি সমূহ সর্বদা অনুসরণ করতে সর্তকরা অবলম্বন করেছি এবং সেই ভাবেই এগিয়ে গিয়েছি ।

Dhaka University Institutional Repository

## প্রথম অধ্যায়

### রাজনৈতিক দল গঠনের তত্ত্বগত ধারণা ঃ

রাজনৈতিক দল জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষনার্থে নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ লোক সমষ্টির যৌথ প্রয়াস। এডমান্ড বার্ক, মরিস ডুভারজার, এ্যালমন্ড ও পাওয়েল, ম্যাকাইভার, লা পালমবারা, যোসেফ সুমপিটার প্রমুখ প্রখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা ও কার্যক্রম সম্পর্কে বিশ্লেষণ করেছেন। এডমান্ড বার্কের মতে, "কতকগুলি লোক যখন তাদের সমবেত চেষ্টার দ্বারা সার্বজনীন স্বার্থ অর্জনের উদ্দেশ্যে কতকগুলি নীতি সম্বন্ধে একমত হয়ে সংঘবদ্ধ হয়, তখন রাজনৈতিক দল গড়ে উঠে।"[১] মরিস ডুভার্জারের মতে, "দল হচ্ছে নির্দিষ্ট কাঠামো ভিত্তিক একটা সম্প্রদায়।"[২] অপরদিকে এ্যালমন্ড ও পাওয়েল বলেন," দল হচ্ছে আধুনিক সমাজের বিশেষীকৃত একত্রীকরণ কাঠামো।"[৩] আবার ম্যাকাইভার বলেন," রাজনৈতিক দল বলতে সেই জনসমষ্টিকে বুঝায়, যারা বিশিষ্ট এক কার্যনীতির ভিত্তিতে একত্রিত ও সংহত হয়েছেন এবং যারা নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সরকার গঠনের জন্য প্রয়াসী।"[৪] সুমপিটার ক্ষমতা দখলও তথায় টিকে থাকার প্রয়াসের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দলের ব্যাখ্যা দেন।"[৫] উল্লেখিত সংজ্ঞাগুলি বিশ্লেষণ করলে রাজনৈতিক দলের কয়েকটি

---

1. Edmund Burke,- Selected works ed. with introduction and notes by E.J.Payne,1877,P-16
2. Maurice Duverger,Palitieal Parties,Methuen and co. ltd. London,First published 1951,P-10
3. Almond and powell,Comparatine politics: System,Process and policy little Brown and company,1978,P-40
4. R.M. MacIver,'The web of government', The free press,New York,1965,P-28
5. J. Schumpeter, Social scientist by Seymour E Harris,1951, Cambridge,Harvard university press,P-30

Dhaka University Institutional Repository

বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে উঠে। প্রথমতঃ একাবদ্ধ জনসমষ্টি, দ্বিতীয়তঃ সাংগঠনিক কাঠামো ও শৃঙ্খলা, তৃতীয়তঃ স্বার্থ জ্ঞাপন ও স্বার্থ একত্রীকরণ, চতুর্থতঃ নীতি ও আদর্শ এবং পঞ্চমতঃ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় টিকে থাকা। এই মৌলিক পাঁচটি দিকে লক্ষ্য রেখে রাজনৈতিক দল গঠিত হয়। অবশ্য রাজনৈতিক দলের মধ্যে অনানুষ্ঠানিকভাবে মতদ্বৈততা ভিন্নমত, রেষারেষি ইত্যাদির আকারে উপদলের অস্তিত্ব থাকে। সুতরাং একটা রাজনৈতিক দলের নীতি অক্ষুন্ন রেখে এক বা একাধিক বিষয়ে মতানৈক্য দেখা দিলে কিংবা দলের ভিতরে বা বাইরে মর্যাদা ও ক্ষমতা লাভের প্রতিদ্বন্দ্বিতা মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে কিংবা দলীয় সাংগঠনিক কাঠামোর শৃঙ্খলা বিনষ্ট হবার পরিপ্রেক্ষিতে দলের অভ্যন্তরে যে ক্ষুদ্র বিরোধী গ্রুপ বা গোষ্ঠী সৃষ্টি হয়, তাকে উপদল ( Faction ) বলা হয়।[৬] Gould সম্পাদিত 'A Diction of Social science গ্রন্থে উপদলীয় প্রবণতার সংজ্ঞা নির্দিষ্ট হয়েছে এইভাবে, "উপদল বিরাজ করে যখন একটি বৃহত্তর গোষ্ঠীর সদস্যদের দ্বারা গোষ্ঠীর অভ্যন্তরে উপ-গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয় এবং এরা নিজেদেরকে বাকী অংশ থেকে পৃথক মনে করে"।[৭]

উপদল অনানুষ্ঠানিকভাবে যতদিন দলের অভ্যন্তরে বিরাজ করে ততদিন তা দলীয় শৃঙ্খলার সীমা অতিক্রম করে না। কিন্তু উপদল যখন আনুষ্ঠানিক রূপলাভ করে তখন দলে কোন্দল ও বিরুদ্ধতা দেখা দেয় এবং দলে ভাংগন সৃষ্টি হয়। সুতরাং দল ভাংগনের রাজনীতি শুরু হবার কারণ হিসাবে ক্রিয়াশীল উপদলীয় অস্তিত্বের উপাদানটিই গুরুত্বপূর্ণ। অত্যধিক শক্তি নিয়ে কিংবা ক্রিয়ারত থেকে উপদল দলীয় কাঠামো, সংগঠন, শৃঙ্খলা, ঐক্যমত আদর্শের মূলে আঘাত হানে। ফলে অনিবার্যভাবে দলভাংগার রাজনীতি শুরু হয়। উপদলীয় কোন্দল প্রথমে থাকে দলের অভ্যন্তরে এবং পরবর্তীতে মাত্রাধিক তীব্রতা লাভ করলে তা দল বহির্ভূতঃ হয়ে পড়ে এবং দলীয় আনুগত্যে পরিবর্তন এনে দলে ভাংগন ধরে।

---

৬। রাষ্ট্র বিজ্ঞান পরিভাষা কোষ, কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ১৯৭০।

৭। A Dictionary of Social sciencesc edited by Gould and Kolb, Tavistock publications, UK., 1964, P. 225.

Dhaka University Institutional Repository



রাজনৈতিক দল বা উপদলের মধ্যে কয়েকটি পার্থক্য আমরা নির্দেশ করতে পারি। উপদল বা গোষ্ঠী দল সীমাবদ্ধ লক্ষ্য নিয়ে অগ্রসর হয় এবং তাদের স্বার্থ বা সার্বজনীন স্বার্থের প্রতি নজর নাও দিতে পারে। তা ছাড়া, উপদল নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার জন্য সংগঠিত হয় না। তা ছাড়া রাষ্ট্রের অধিক সংখ্যক লোকের মধ্যে এদের তেমন আবেদন থাকে না। আবার উপদলের সুপরিকল্পিত কার্যক্রম, কর্মপদ্ধতি এবং স্থায়ী সংগঠন নাও থাকতে পারে, একই সংগে বলা যায়, উপদল বিশেষ ব্যক্তিদের সংকীর্ণ নীতি বাস্তবায়নে তৎপর থাকে।

একটা রাজনৈতিক দলে নীতি বা কর্মসূচীর ব্যাপারে মতানৈক্যকে কেন্দ্র করে, কিংবা দলে বিশেষ সুযোগ লাভের কামনা বৃদ্ধি পেলে অথবা সংগঠনিক কাঠামোয় বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে উপদলীয় কোন্দল সৃষ্টি হয়।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে এই উপদলীয় কোন্দল এত বেশী ক্রিয়ারত যে রাজনীতি মানেই আজ মনে হয় দল ভাংগন, দলীয় কোন্দল ও বিধিবর্হিভূত ক্ষমতা দখলের প্রবনতা। সুতরাং এ ধরনের মাত্রাতিরিক্ত দল ভাংগনের প্রবনতার কারণ সম্পর্কে গবেষণা করবার পূর্বে তত্ত্ব গত ভাবে রাজনৈতিক দলের ভাংগনের কারণ চিহ্নিত করতে হবে।

আমি মনে করি তত্ত্বগতভাবে উপদলীয় কোন্দল বিশ্লেষনের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলের উপর অন্যান্য উপদানের প্রভাবসমূহের বিশ্লেষন, পর্যালোচনা, ব্যাখ্যা বা পরিমাপ করা বাঞ্চনীয়। তাই বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী সমাজবিজ্ঞানী প্রদত্ত সুচিন্তিত অভিমত থেকে রাজনৈতিক দলভাংগনের তত্ত্বগত কারণ সমূহকে নিয়ে বিশ্লেষনের মাধ্যমে আলোচনা করেছি।

মধ্যবর্তীকালীন সমাজ এবং উপদলীয় কোন্দল ও দল ভাংগনের রাজনীতিঃ

পাশ্চাত্যের অতিসাম্প্রতিকালের রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা সকল সমাজে "মিশ্র সংস্কৃতি"র কথা উল্লেখ করেছেন।[৮] কাজেই সমাজে বিভিন্ন পদ্ধতি, বিশ্বাস, কর্মচেনা, আদর্শগত বিরোধ, দ্বন্দ্ব কিংবা পরস্পর বিরোধিতা থাকাটাই স্বাভাবিক। এই বৈশিষ্ট্যগুলি পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী কিংবা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে উপস্থিত থাকলেও সেখানে একটা প্রধান বা নির্ধারিত বৈশিষ্ট্য থাকে। ফলে উন্নত দেশের রাজনীতি সুসংগঠিত। আর তাই ভিন্নমতগুলি

---

৮। Gabriel A Almono, "A Functional opproach comparative poli in Almond and coleman, "politics of the developing Areas Princeton, Newjersy, princeton university press, 1960, P.11-

Dhaka University Institutional Repository


নির্দিষ্ট একটি পর্যায় পর্যন্ত এসে ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রিত হয়ে যায় ।

কিন্তু উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলিতে আমরা এর সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র দেখতে পাই । এই সমস্ত সমাজে বর্তমানে এক মধ্যবর্তী কালীন পর্যায় অতিক্রম করছে । আর তাই আমাদের অর্থনীতি, রাজনৈতিক, ব্যক্তিক জীবনে দেখা দিয়েছে অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলা । ফলে ব্যক্তি জীবনে, সামাজিক জীবনে এবং সর্বোপরি রাজনৈতিক জীবনে এই অঞ্চলের রাজনৈতিক গোষ্ঠী নিজেদের চাওয়া পাওয়া, লক্ষ্য উদ্দেশ্য কিংবা আদর্শকে সুনির্দিষ্ট করতে পারছে না । ধর্ম, গণতন্ত্র, সমাজব্যবস্থা, অর্থনীতি, কিংবা সরকার ব্যবস্থাও আরও অসংখ্য বিষয়ে উন্নয়নশীল দেশের রাজনৈতিক দলগুলি পরস্পর বিরোধী মতবিরোধিতার পর্যায়ে অবস্থান করছে । আর একই কলশ্রুতিতে রাজনৈতিক দলগুলি অসংখ্য উপদল বা দলে বিভক্ত হয়ে পড়ছে ।

উন্নয়নশীল দেশগুলির এই মধ্যবর্তীকালীন পর্যায়ে শুধু দেশীয় বা জাতীয় বৈশিষ্ট্যগুলিই নয় আন্তর্জাতিক প্রভাবের উপর মাত্রাতিরিক্ত আনুগত্য ও ডেকে আনে দলভাংগন ।

সীমিত সম্পদ সমাজে রাজনৈতিক ক্ষমতার ব্যবহার ও ক্ষমতার লোভ :

উন্নয়নশীল দেশগুলির অধিকাংশেই সম্পদ সীমিত । যেহেতু এই সমস্ত দেশে অর্থনীতি তেমন শক্তিশালী নয় এবং কোন প্রভাবশালী অর্থনৈতিক শ্রেণী নেই তাই স্বাভাবিকভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতার দ্বারা অর্থনীতি প্রভাবিত হয় । ফলে রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্থনৈতিক সম্পদ ও সুযোগ লাভ কে সম্ভব করে ।

ক্ষমতা ও পদের মোহ ও আকাঙ্খা বাংলাদেশের ন্যায় দরিদ্র ও অনগ্রসর সমাজে কোন্দলের রাজনীতি ও দলভাংগনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট ইন্ধন যোগায় । কারণ এই সমস্ত রাষ্ট্রগুলিতে ক্ষমতা ও পদকে এক বিশেষ দৃষ্টিতে দেখা হয় । সুতরাং যতবেশী ক্ষমতা প্রয়োগ করা যাবে বা উঁচু পদে আসীন হওয়া যাবে তত বেশী আর্থিক লাভের সুযোগ ঘটবে । এই কারণে দেখা যায় অবসরপ্রাপ্ত বা ছাটাই হয়ে যাওয়া মন্ত্রী, সামরিক কর্মকর্তা, আমলা রাজনৈতিক দলে যোগ দিয়ে থাকেন, । স্বাভাবতই গড়ে উঠে নতুন দল কিংবা কোন্দল বাঁধে দলে এবং দলটি ভাংগনের সম্মুখীন হয় ।

অনেক সময় উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলিতে একের পর এক সামরিক সরকারগুলো নিজেদের অবৈধভাবে দখল করা ক্ষমতাকে বৈধ করবার জন্য নিজেদের নিয়ন্ত্রনাধীনে গ্রহনমূলক নির্বাচন

Dhaka University Institutional Repository


অনুষ্ঠিত করে । এক্ষেত্রে তারা অন্যান্য দলে ভাংগন সৃষ্টি করে, কোন কোন নেতা বা কর্মীদের প্রলোভনের মাধ্যমে আকৃষ্ট করে অনেক সময় ফ্রন্টও গঠন করে। অপরদিকে স্বার্থ, দলছুট, সুবিধালোভী ব্যক্তিরা অর্থ, বিত্ত, সুযোগ , মন্ত্রীত্ব এবং মর্যাদার লোভে দলে ভাংগন ধরিয়ে নতুন দলে চলে আসে ।

আবার দেখা যায় অনেক দল আছে যাদের সদস্যরা নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে হতাশ, তারা নিজেদের দলীয় অস্তিত্ব বিলুপ্ত করে অথবা সে দলের কোন কোন নেতা স্বীয় সমর্থকদের নিয়ে সরকারী দলে যোগ দেন । এই সময় তারা পূর্ববর্তী দলে যেমন কোন্দল সৃষ্টি করে চলে এসেছিলেন তেমনি সরকারী দলে গিয়ে সৃষ্টি করেন আরেক উপদল ।

যেহেতু সরকারী ক্ষমতা লাভের সংগে সে দলের নেতা, কর্মী ও সমর্থকদের সামনে ব্যাপক অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা ভোগের সুযোগ আসে সেহেতু দল ত্যাগী নেতা কর্মীদের সরকারী দলে যোগদানের উৎসাহ দেখা দেয় ।

নিয়মিত গণতান্ত্রিক নির্বাচনের অভাব ও নির্বাচক মন্ডলীর গুরুত্বহীনতা :

সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশ সমূহে যখন অর্থসামাজিক ব্যবস্থার কাঠামো ভেংগে পড়ে তখন সামরিক বাহিনী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় । নিজদের স্বার্থ টিকিয়ে রাখবার জন্য অনেক ক্ষেত্রে গণতন্ত্রকে হত্যা করা হয় এবং স্বভাবতই তখন কর্তৃত্ববাদী ও স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতা কাঠামো গড়ে উঠে । অপরদিকে ক্ষমতায় এসে সামরিক সরকারও স্বীয় অবস্থানগত সমস্যা কারণে এবং সংকীর্ণ শ্রেণীগত স্বার্থে দলীয় ব্যবস্থায় ভাংগন আনে । আর শেষোক্ত ক্ষেত্রে সামরিক শাসক দেশে নিয়মিত বিরতিতে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানকে ব্যহত করে । একদিকে নিজেদের জনবিচ্ছিন্নতা ও অস্থনির্ভরতার কারণে তারা গণতান্ত্রিক নির্বাচনকে স্বাগত জানায় না, অন্যদিকে নিয়মিত সাধারণ নির্বাচনকে বানচাল অথবা খেয়াল খুশীমত নির্বাচন করে । অনেক সময় আবার তারা রাজনৈতিক দলগুলোকে জন বিচ্ছিন্ন, ব্যক্তি নেতৃত্ব, কথা সর্বস্ব এবং অবৈধ ক্ষমতা লাভের মাধ্যমে হিসাবে গড়ে তোলে ।

উপদলীয় কোন্দল ও দলভাংগার রাজনীতি :

অর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে :- যদিও অর্থনীতি রাজনীতির ভিত্তি রাজনীতিও অর্থনীতির উপর ক্রিয়াশীল প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান । রাজনীতির এই প্রভাব অর্থনীতি ক্ষেত্রে নয়ে আসে ব্যাপক পরিবর্তন । সামাজিক বিপ্লবের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কাঠামোতে

Dhaka University Institutional Repository


আসে বৈপ্লবিক পরিবর্তন । সুতরাং তত্ত্বগতভাবে বলা যায়, অর্থনীতি ও রাজনীতি পরস্পর নির্ভরশীল এবং উভয়ের মধ্যে রয়েছে গভীর সম্পর্ক । তাই কোন সমাজে রাজনীতিকে সুদৃঢ় সুসংগঠিত ও শক্তিশালী করতে হলে স্থিতিশীল অর্থনৈতিক ভিত্তি থাকা প্রয়োজন । কিন্তু শ্রেণী বিভক্ত সমাজে রাজনীতি নিয়ন্ত্রক যা স্থিতিশীল থাকতে পারে না বলে সেখানে রাজনীতি হয়ে উঠে প্রভাবশালী শ্রেণীর রাজনীতি । যে সমস্ত সমাজে শ্রেণী বিভক্তি তাতে সেখানে রাজনৈতিক দল শ্রেণী স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব এবং প্রকাশ্যে কিংবা গোপনে প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরোক্ষভাবে রাজনৈতিক দল গুলো শ্রেণী সংগ্রামেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটায় । কিন্তু এর বিপরীত চিত্র দেখা যায় উন্নত রাষ্ট্র গুলিতে উন্নত পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর রাজনীতিতে দলের সংখ্যা কম এবং দলগুলি স্থায়ী ভিত্তিতে গঠিত । ফলে বুর্জোয়া শ্রেণী খুব স্থিতিশীলতার সংগে অর্থনীতিতে প্রতিষ্ঠিত । স্বভাবতই এই ধরনের কাঠামোতে তাদের স্বার্থ তাদের অত্যন্ত সুরক্ষিত । সেজন্যই বুর্জোয়াদের মধ্যে দলাদলি কম, ভাংগন কম এবং কোন্দলের রাজনীতিও কম ।

অপরদিকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতেও দেখা যায় দলাদলি বা কোন্দলের রাজনীতি অত্যন্ত কম । এর প্রধান কারণ হলো সেখানে সফলতার সাথে অর্থনীতিকে সামাজিকীকরন করা হয়েছে এবং অর্থনীতিতে শ্রমজীবি শ্রেণীর পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত রয়েছে । উপরন্তু কমিউনিস্ট পার্টি ক্ষমতায় থাকায় এবং মৌল নীতিমালার ব্যাপারে সামগ্রিক ঐক্যমত বজায় থাকায় রাজনৈতিক দলাদলি থাকলেও দলে ভাংগন পরিলক্ষিত হয় না ।

আমরা যদি উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলির দিকে দৃষ্টি দেই তবে সেখানে দেখবো এর সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা বিরাজ করছে । কারণ এখানে পুঁজিপতিগণ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রাধান্য থাকলেও তারা সম্পূর্ন স্বাধীন কিংবা স্বাবলম্বী নয় । যেহেতু তাদের অর্থনীতি পরস্পরের উপাদানের উপর নির্ভরশীল সেহেতু এর ভিত্তি ও সুদৃঢ় এবং স্থিতিশীল নয় । এই অস্থিতিশীল রাজনীতি স্বভাবতই অর্থনীতিকেও করে তোলে বিপর্যস্ত । এরূপ অবস্থায় কোন্দলের রাজনীতি এবং দলের ভাংগন অতি স্বাভাবিক ঘটনায় পরিনত হয়ে পড়ে । আবার এই সমস্ত রাষ্ট্রগুলিতে মুষ্টিমেয় সংখ্যক পুঁজিপতি ছাড়া সমাজে রয়েছে সংখ্যাগরিষ্ঠ মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণী । আর এই শ্রেণী গড়ে উঠেছে রাজনৈতিক টাউট, সামরিক বাহিনী, আমলাতন্ত্রের সদস্য, চোরাকারবারি কালো টাকার মালিক, ছাত্র সম্প্রদায় এবং কিছু সংখ্যক সুযোগ সন্ধানী ব্যক্তির সমন্বয়ে । এরা মূলতঃ অর্থনৈতিক ও উৎপাদন বিচ্ছিন্ন কিন্তু রাজনীতিতে সক্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে । তদুপরি সামরিক ক্ষমতা

Dhaka University Institutional Repository

প্রয়োগ করে। কাজেই এখানে ঐক্যমতের অভাব পরিলক্ষিত হয় এবং দেখা দেয় নানা বিরোধ, অবিশ্বাস এবং মতবিরোধ। এরূপ পরিস্থিতিতে রাজনীতি হয়ে পড়ে, ফলে দলের মধ্যে বিভিন্ন দল গঠন ও ভাংগন, রাতারাতি দল বদল এবং দল বিলুপ্তির রাজনীতি অনিবার্য হয়ে উঠে।

শহুরে উচ্চ ও মধ্যবিত্ত কেন্দ্রিক রাজনীতি ও দলাদলি :

অধিকাংশ উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের রাজনীতি শহর কেন্দ্রিক এবং শহরের উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে থেকে রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা রাখছে। ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, ব্যবহারজীবি, বুদ্ধিজীবি, সামরিক শ্রেণী, আমলা এবং উকিলরা সব। তাই শহরে রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রন করছেন, কোন্দল সৃষ্টি করছেন, দল ভাংগছেন এবং নতুন দলে যোগ দিচ্ছেন।

অপরদিকে এই সমস্ত রাষ্ট্রগুলির সংখ্যা গরিষ্ঠ জনগনের বসবাস হচ্ছে গ্রামে। এরা অধিকাংশই দরিদ্র, অশিক্ষিত, অভাবগ্রস্থ, পশ্চাদপদ এবং খেটে খাওয়া মানুষ। সুতরাং স্বভাবতঃ রাজনীতির প্রতি এদের রয়েছে অনাস্থা এবং উদাসীনতা। জীবনের তাগিদে এরা এত ব্যস্ত থাকে যে রাজনীতিতে এদের ভূমিকা প্রায় নেই বললেই চলে। সুতরাং সিদ্ধান্তগ্রহণকারী গোষ্ঠী হিসাবে শহরের মুষ্টিমেয় সম্পদশালী ও কমবেশী শিক্ষিত জনগনই একচেটিয়া ভাবে ভূমিকা রাখছে। রাজনীতিতে এদের প্রকৃত পরিচয় হলো উৎপাদন থেকে বিচ্ছিন্ন একটি গ্রুপ। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নিয়ন্ত্রনাধীন রাজনৈতিক কর্মকান্ড ও কাঠামো বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। বাস্তবে তাই দেখা যায় এখানে রাজনৈতিক দলে উপদলের সৃষ্টি হয় এবং দলের অভ্যন্তরের কোন্দল ভাংগনের আকারে প্রকাশিত হয়। এই ভাবে প্রতিনিয়ত দল ভাংগে কিংবা নতুন দল গড়ে উঠে।

মৌলনীতির ঐক্যমতহীনতা ও ভিন্নতা :

মৌলনীতিমালার ব্যাপারে ঐক্যমত একটা দেশের সুস্থ সুনির্দিষ্ট ও কার্যকর রাজনৈতিক পরিবেশের পূর্ব শর্ত হিসাবে কাজ করে।

তাত্ত্বিক এই ধারনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় আমরা যদি পশ্চাত্যের উন্নত গনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতি দৃষ্টি দেই তাহলে দেখবো সেখানে গণতান্ত্রিক ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় রাজনীতি দৃঢ় ভিত্তি লাভ করেছে। তেমনি উন্নত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সমাজবাদ ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সেখানে কমিউনিষ্ট পার্টির মাধ্যমে সমাজবাদী শাসন পরিচালিত হচ্ছে। ঐক্যমত রয়েছে বলে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, রাজনৈতিক শাসন, সরকারের রূপ ও প্রতিষ্ঠানে সমূহের ভূমিকা সম্বন্ধে

Dhaka University Institutional Repository



মধ্যে স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । এর ফলে দেখা যায় উন্নত রাষ্ট্রগুলিতে কোন্দলের রাজনীতি এবং উপদলের রাজনীতি বিরাজমান রয়েছে একটা সীমার মধ্যে এবং তাই সচরাচর দল ভাংগন বা দল সৃষ্টি কম হয় ।

এটা তত্ত্বগতভাবে সত্য যে মৌলিক নীতিমালার ক্ষেত্রে ঐকমত্য না থাকলে যে বৈশিষ্ট গুলি প্রাধান্য পায় সেগুলি হচ্ছে সমঝোতার অভাব, অস্থিরতা, বিচ্ছিন্ন চিন্তার বহিঃপ্রকাশ । আর এরই সূত্র ধরে রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি হয় এবং অনেকে দল বদলায়, দলভাংগে এবং নতুন দল গড়ে ।

এই তত্ত্বধরে আমরা যদি উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করি তাহলে দেখবো এই সমস্ত রাষ্ট্রগুলিতে নীতিমালার ব্যাপারে ঐকমত্য হীনতা অসংখ্য মত, অস্পষ্টতা, বিবাদ ও পরস্পর বিরোধিতা তৈরী করেছে ও করছে । এরফলে প্রতিনিয়ত কোন্দলে পূর্ন হয়ে উঠেছে এখানকার রাজনীতি । আর তাই দলগড়া, দলবদল ও দল ভাংগার রাজনীতি এই সমস্ত রাষ্ট্রগুলির নিত্য দিনের চিত্রে পরিনত হয়েছে ।

উপদলীয় কোন্দল বা দলভাংগার রাজনীতির অন্যতম কারণ হলো সামাজিকীকরন প্রক্রিয়ায় অসম্পূর্নতা ।[৯] এ প্রসংগে সমাজের রাজনৈতিক দৃষ্টির ভূমিকাও উল্লেখ্য ।

রাজনৈতিক সামাজিকীকরন বলতে মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটানোর পদ্ধতিকেই বোঝায় । এই পদ্ধতির উদ্দেশ্য হোল রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং এর ভূমিকা সম্পর্কে মনোভাব, জ্ঞান, মূল্যবোধ ও অনুভূতি ।

ফ্রেড গ্রীনস্টেইনের মতে, " রাজনৈতিক সামাজিকীকরন হল নিয়মিত ও অনিয়মিত, ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত রাজনৈতিক শিক্ষা । এই সামাজিকীকরন দ্বারা রাজনীতির প্রতিটি কলাকৌশল, কর্মপদ্ধতি ও আচরন প্রভাবিত হয় ।[১০]

---

৯। F.G. Bailey, 'Politics and social change',Oxford university press,1963.P-

১০। Fred Greenstein,"Political socialization," The International encyclopedia of social sciences,1968,Vol.14,P-551.

Dhaka University Institutional Repository



এর প্রধান কারণ হলো এই সমস্ত দেশে জন্মের পর থেকে একটি শিশু তার পরিবারের কাছ থেকেই পায় গণতন্ত্রের প্রথম শিক্ষা । সে পরিবারে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সম্পর্কে যে জ্ঞান অর্জন করে তারই প্রতিফলন দেখতে পায় পরবর্তীতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে এবং তার বন্ধুদের মধ্যে । অতঃপর জীবিকা ও চাকুরীর ক্ষেত্রে এবং রাজনৈতিক পরিমন্ডলেও একই ভাবে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ চালু থাকে । সুতরাং এই সমস্ত রাষ্ট্রগুলিতে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া ভিন্ন পরস্পর বিরোধী এবং যোগাযোগ বিহীন অবস্থায় গড়ে না ওঠে বরং ধারাবাহিকভাবে ইতি বাচক মনোভাব নিয়ে গড়ে উঠে । ফলে গণতান্ত্রিক কাঠামোয় সুষ্ঠু প্রতিদ্বন্দ্বিতাতেও তাদের ভূমিকা মোটামুটি সুনির্দিষ্ট থাকে । উপরন্তু গণতান্ত্রিক চেতনা ও আধুনিক দৃষ্টি ভংগীর সংগে সামাজিক সহযোগিতা বিদ্যমান থাকায় উন্নত দেশগুলিতে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় নিরবচ্ছিন্ন অটুট থাকে । আর এই বৈশিষ্টটিই ব্যক্তি, নেতৃত্ব ও রাজনৈতিক কর্মীদের রাজনৈতিক আদর্শ, নীতি কর্মসূচী, আলাপ আলোচনায় মীমাংসা, নির্বাচনে বিশ্বাস ইত্যাদি কর্মকান্ডের মধ্যে রাখে । তাই রাজনীতিতে মাত্রাতিরিক্ত কোন্দল, উপদলীয় বিবাদ, রাতারাতি দল ভাংগা, দলগড়া এসব উন্নত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সম্ভব না ।

এরই সম্পূর্ন এক বিপরীত মুখী অবস্থা আমরা দেখতে পাই উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলিতে । রবার্ট লেভীন এশিয়া ও আফ্রিকার রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ পদ্ধতি বিশ্লেষন করে অভিমত প্রকা যে, সামাজিকীকরনের মাধ্যম সমূহ অপর্যাপ্ত, অসব হওয়ায় উন্নয়নশীল দেশগুলি দ্রুত পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছে । তার মতে এসব দেশে পারিবারিক সামাজিকীকরণ মাধ্যম সমূহ ও জাতীয় ক্ষেত্রে সামাজিকীকরনের ভিতর বিচ্ছিন্নতা রয়েছে । কাজেই উপদলীয় কোন্দল ভাংগন এর রাজনীতি উন্নয়নশীল দেশে বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয় ।[১১]

এডওয়ার্ড বেনফিল্ড দক্ষিন ইতালীতে ব্যক্তির পরিবারের উপর নির্ভর শীলতার বিষয়টি কে অনুরূপ সমস্যা সৃষ্টিকারী উপাদান হিসেবে দেখিয়েছেন ।[১২]

---

১১। Robert Levine, "Political socialization and cultural change in clifford Gecrtz, ed. old societies and New states, New Yo Free press, 1963, P-282.

১২। Edward C. Banefield, 'The Moral Basis of a Backward society Glencoe, Illionois, Free press, 1958.

Dhaka University Institutional Repository



লুসিয়ান পাই বার্মার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে বলেন যে, বার্মার সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে সেখানে পরিবারের প্রতি প্রশ্নাতীত আনুগত্য , বাধ্য এবং বিশ্বস্ত থাকবার প্রভাব বিদ্যমান থাকায় পরিবারের বাইরে অপরের প্রতি বা অপরিচিতের প্রতি স্বভাবতই অবিশ্বাস, সন্দেহ ও আস্থাহীনতার মনোভাব গড়ে তোলে । তাই রাজনীতির আঙিনাতেও এর প্রভাব পড়ে এবং রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে উঠে আস্থাহীন ও অসহযোগিতার মূলক ভাবে ।[১৩]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে সামাজিকীকরন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন সমস্যা ও ভাংগনের কারণে গণতন্ত্রে সফলতা আসছে না এবং কোন্দল ও দলভাংগার রাজনীতি বহুল্যাংশে বৃদ্ধি পাচ্ছে ।

ক্যারিজমাকেন্দ্রিক ও ব্যক্তিনেতৃত্বের রাজনীতি :

মায়রন ইউনার, পল ব্রাস, প্রমুখ রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে গতানুগতিক সমাজে উপদলীয় কোন্দলের অন্যতম একটা সূত্র হচ্ছে ব্যক্তিকেন্দ্রিক রাজনীতি ।[১৪] যখন রাজনীতিতে মর্যাদা বা সম্মান সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব পায় তখন এর উপশমের আশা প্রায় থাকেই না । ফলশ্রুতিতে দল ভাংগনের সম্মুখীন হয় ।

ব্যক্তিকেন্দ্রিক নেতৃত্ব গড়ে উঠবার পিছনে পারিবারিক ব্যবস্থা অনেকটা অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে । পারিপারিক কাঠামোয় সেক্যুলার যৌথ পরিবার কিংবা একালের একক পরিবারের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে পারিবারিক কাঠামোতে পিতার প্রভাব ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত । যার ফলে গোটা পরিবারের সদস্যদের ইচ্ছা অনিচ্ছা, বিবেচনা, বিচার, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এসবকিছুই একদিকে যেমন পিতার প্রভাবে প্রভাবিত হয় অপরদিকে তেমনি এগুলির প্রকাশও ঘটে তার মাধ্যমে । সুতরাং পিতৃ-কেন্দ্রিকতা, পিতৃপ্রাধান্য, পিতৃনির্ভরতা, পিতৃমান্যতা, ইত্যাদি জনগনের মানসিকতা ও সংস্কৃতিতে ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে ।

পরিবারে এ ধরনের পিতৃপ্রাধান্য উন্নয়নশীল দেশের রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকেও নিয়ন্ত্রন করবার সুযোগ পেয়েছে । আর তাই আজ ব্যক্তিকেন্দ্রিক নেতৃত্ব সুনির্ভর রাজনৈতিক কাঠামো গড়ে উঠবার পথে অন্তরায় হিসাবে দেখা দিয়েছে । একই সংগে বাঁধা প্রাপ্ত হচ্ছে বিষয়নীতি ও আদর্শ কর্মসূচী নির্ভর সুসংগঠিত দল গঠনের প্রক্রিয়া ।

---

১৩ Lusian W. Pye, Politics, personality, and Nation Building: Burma's Search for Identity, New Havan, Yale university press, 1962.

১৪. Myron Weiner, "Villege and party Factionalism in Andhra, ponnur constituency: Economic weekly, Vol. XIV, Sep. 1962. P-1509-1518.

Dhaka University Institutional Repository


রাজনীতিতে ব্যক্তি নেতৃত্বের জন্ম হয় ক্যারিজমা দ্বারা অথবা শক্তি বা অস্ত্রের জোরে। তবে ক্যারিজমা তৈরীর জন্য প্রয়োজন নির্দিষ্ট অর্থ সামাজিক ব্যবস্থা এবং অনুকূল পরিবেশ ও পরিবেশ ও পরিস্থিতি। ম্যাক্সওয়েবার ক্যারিজমাকে "অযৌক্তিক, ব্যক্তিগত আনুগত্য ও ভক্তি নির্ভর নেতৃত্ব" হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।[১৫] ওয়েবার মনে করেন এই ধরনের ব্যক্তি কেন্দ্রিক নেতৃত্ব এক্সে এক্সে স্বৈরাচারী হয়ে উঠে। বিশেষতঃ রাজনীতিতে সুসংগঠিত দল ব্যবস্থার অভাব থাকলে ক্যারিজমা কেন্দ্রিক নেতৃত্ব স্থির ব্যবস্থা সৃষ্টিতে অনুকূল পরিবেশ পায়।

ক্যারিজমা সুলভ নেতৃত্ব ক্ষমতায় টিকে থাকবার জন্য নিয়ম নীতির উপর নির্ভর না থেকে বরং স্বৈরাচারের জন্ম দেয়। একই সংগে সুশৃঙ্খল দল ব্যবস্থা, সংগঠিত সরকারী প্রশাসন এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানাধির বিকাশ বাঁধা প্রাপ্ত হয় ক্যারিজমা কেন্দ্রিক নেতৃত্বের প্রতি সীমাহীন ও শর্তহীন আনুগত্য বিরাজমান থাকায়। এমনকি ক্যারিজমা নির্ভর ব্যক্তি নেতৃত্ব যুক্তিহীন ভাবে ক্ষমতার পরিবর্তনের নিয়মনীতিকে ধ্বংস বা বিনষ্ট করতে সাহায্য করে।

এ ধরনের বৈশিষ্ট্য মন্ডিত ক্যারিজমাকেন্দ্রিক ব্যক্তি নেতৃত্ব একান্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিক হওয়ায় রাজনীতিতে আস্থাশীলতার সূত্রপাত ঘটায়।[১৬] বিশেষতঃ একটি উন্নয়নগামী পশ্চাদপদ, সমস্যা সংকুল সমাজে ক্যারিজমা যখন ব্যর্থ পর্যবসিত হয় তখন গণঅসন্তোষ, বিক্ষোভ, চরম আকার ধারন করে। ফলে অনিবার্য ভাবে ক্যারিজমেটিক নেতৃত্ব ক্ষমতাচ্যুত হয়। সৃষ্টি হয় রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা কোন্দল ও দলভাংগন।

---

১৫। Max Weber, "Charisma and Institution Building", Chicago, university of Chicago press, 1968, P-20

১৬। K.J.Rathnam, "Charisma and political leadership," political studies Quarterly, Vol. XII.1964.

Dhaka University Institutional Repository



এই তত্ত্বগুলো ছাড়াও সাম্প্রতিক কালে রাজনৈতিক বিশ্লেষণ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক কৃষ্টি সম্পর্কিত ধারনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন হয়ে উঠেছে । এ ধারনার প্রথম প্রবর্তক গ্যাব্রিয়েল অ্যালমণ্ড। অ্যালমন্ডের মতে, "রাজনৈতিক কৃষ্টি হলো কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থার সদস্যদের রাজনীতি সম্পর্কে মনোভাব ও দৃষ্টিভংগীপ্রতিকৃতি।"[১৮] অপরদিকে লুসিয়ান পাই এর মতে, "রাজনৈতিক কৃষ্টি হলো ধ্যানধারনা, বিশ্বাস ও অনুভূতির এক সমষ্টি যা রাজনৈতিক কার্যকলাপকে অর্থপূর্ন করে তোলে ও রাজনৈতিক কার্যকলাপের মনস্তাত্ত্বিক ও আভ্যন্তরীন দিকের সার্বিক প্রকাশ ঘটে রাজনৈতিক কৃষ্টিতে"।[১৯] রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও তার বিভিন্ন অংশ ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় তার ভূমিকা সম্পর্কে ব্যক্তির ধ্যানধারনা ও মনোভাব রাজনৈতিক কৃষ্টিতে প্রতিফলিত হয়ে উঠে ।

উল্লেখিত তত্ত্বের আলোকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক কৃষ্টির দিকে দৃষ্টিপাত করলে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠবে ।

বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় নীতিমালার ক্ষেত্রে ঐক্যমতহীনতা, দ্বন্দ্ব, অসংখ্য মত, বিচ্ছিন্ন চিন্তা, ইত্যাদি পরস্পর বিরোধিতার জন্ম দিচ্ছে । আর এই কোন্দল, দ্বন্দ্ব, বিরোধকে কেন্দ্র করে প্রতি নিয়তই গড়ে উঠছে নতুন দল । আবার গড়ে উঠা দলগুলিও একই কারণে ভেংগে জন্ম দিচ্ছে একাধিক

---

১৭। Gabriel Almond, "Comparative political systems," Journal of politics, Vol. 18, 1956, PP-391-409.

১৮। Gabrial Almond and G. Binghamn powell, "Conmparative politics A Developmental Approach, Little Brown and Co., 1966, PP-32-33.

১৯। Lucian Pye, "Political culture," in Lucian Pye and sidney verba, eds. political culture and political Development, princeton; Princetion university press, 1965, P-513.

Dhaka University Institutional Repository

নতুন দলের। তা ছাড়া অপরাপর উন্নয়নশীল দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও রাজনীতিক সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় নিরবচ্ছিন্নতা নেই। এর মূল কারণ হচ্ছে পারিবারিক সামাজিকীকরণ ও জাতীয় ক্ষেত্রে সামাজিকী করণের ভেতরের বিচ্ছিন্নতা। পরিবারের প্রতি চরম আনুগত্য, ধর্ম চেতনা এবং পরিবারের বাইরে শিল্প প্রতিষ্ঠানে ও কর্মক্ষেত্রে ভিন্ন ধরনের সামাজিকীকরণ পরস্পর বিরোধিতার সৃষ্টি করে। ফলে চিন্তা চেতনায় দেখা দেয় অস্পষ্টতা, দ্বিধা, দ্বন্দ্ব। আর এজন্যই রাজনীতিতে কোন্দল বাঁধে, উপদলীয় প্রবণতা বৃদ্ধি পায়, প্রতিনিয়ত দলভাংগে এবং নতুন দলের জন্ম হয়।[২] আওয়ামী লীগ, মুসলীম লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, কমিউনিস্ট দল সমূহ, জামাতে ইসলামী কিংবা জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল সহ প্রতিটি রাজনৈতিক দলই জন্মলগ্ন থেকে এ পর্যন্ত বহুবার ভাংগনের সম্মুখীন হয়েছে।

বাংলাদেশ হচ্ছে একটি সীমিত সম্পদের দেশ। ফলে এখানকার রাজনীতি গভীরভাবে অর্থনীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়। দেখা যায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ আর্থিক সুবিধা লাভ, সামাজিক পদমর্যাদা মন্ত্রীত্ব ইত্যাদির জন্য স্বীয় দল থেকে বের হয়ে ক্ষমতাসীন দলে যোগ দেন। বিশেষতঃ সামরিক সরকারগুলো রাজনীতিতে টিকে থাকবার জন্য যখন ফ্রন্ট বা রাজনৈতিক দল গঠন করেন। তখনই রাজনৈতিক দলগুলিতে দলভাংগার হিড়িক লক্ষ্য করা যায়। মিজানুর রহমান চৌধুরী, কোরবান আলী, শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, ব্যারিস্টার খালিদ চৌধুরী, শামসুল হুদা চৌধুরী, ইউসুফ আলী, কামরুন নাহার জাফর এই ক্ষেত্রে প্রকৃষ্ট উদাহরণ তাঁদের দলত্যাগের কারণে ভাংগন আসে আওয়ামী লীগ (মিজান), আওয়ামী লীগ (হাসিনা) এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলে।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে ক্ষমতা ও পদকে এতবেশী গুরুত্ব ও লোভনীয় মনে করা হয় যে, যাদের রাজনীতিতে পূর্বে কোন অভিজ্ঞতা ছিল না, তারাও সুযোগ পেলে রাজনীতিতে যোগদেন, মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করেন। কিংবা পার্টি প্রধানের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু এদের রাজনীতিতে অভিজ্ঞতা অনেকাংশে যোগ্যতা এবং জনসম্পৃক্ততা না থাকাতে তাঁরা রাজনীতিতে এসে অনেক সময় দলে কোন্দল বাঁধান, নতুন দল গড়েন কিংবা দলে ভাংগন সৃষ্টি করে পৃথক দল গঠন করেন।

---

২০। Fred Greenstein, "Political socialization , The International Encyclopedia of Social sciences,1968,Vol. 14.P-551.

Dhaka University Institutional Repository

এক্ষেত্রে জেনারেল ওসমানী, মেজর জলিল, রিয়ার এডমিরাল (অবঃ) মোশাররফ হোসেন খান, শেখ হাসিনা বা খালেদা জিয়ার নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

বর্তমানে বাংলাদেশ এক ক্রান্তিকালীন পর্যায়ে রয়েছে অর্থাৎ বাংলাদেশ দুইশত বৎসর বৃটিশ শাসনাধীনে উপনিবেশিক জীবন এবং পরবর্তীতে তেইশ বছর পাকিস্তানের কর্তৃত্বমূলক শাসনাধীনে থেকে স্বাধীনতা লাভ করে বর্তমান সমাজ লাভ করেছে। কিন্তু আজ একদিকে যেমন আমরা গতানুগতিক সমাজের বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলেছি অপরদিকে তেমনি নতুন সামাজিক কাঠামো গড়ে তুলতে পারিনি। স্বভাবতই এর প্রভাব পড়েছে আমাদের ব্যক্তি জীবনে, আর্থ-সামাজিক জীবনে এবং রাজনৈতিক জীবনেও। ধর্ম, সমাজতন্ত্র, মুক্ত অর্থনীতি, গণতন্ত্র, মিশ্র অর্থনীতি, জাতীয়করণ, বিরাষ্ট্রীকরণ, মন্ত্রী পরিষদ ব্যবস্থা, রাষ্ট্রপতি শাসিত ব্যবস্থা ইত্যাদি প্রতিটি রাজনৈতিক বিষয়ে দেখা দিয়েছে অস্পষ্টতা ও মতভিন্নতা। ফলে রাজনৈতিক কাঠামোতে অহরহ বিরোধ, দ্বন্দ্ব, কলহ, কোন্দল লেগেই রয়েছে। এই প্রসংগে উল্লেখ করা যায় বাংলাদেশে বামপন্থী কমিউনিস্টদের কথা। আদর্শের ব্যাখ্যা, কর্মসূচী নির্ধারন, নীতি প্রণয়ন, ইত্যাদি প্রশ্নে মত বিরোধ দেখা দেওয়ায় দলগুলি আজ অসংখ্য দলে বা গ্রুপে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল (মা-লে)(তোয়াহা), বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল (নগেন), বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল (মা-লে) (আব্বাস) এবং বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল (মা-লে) (মোস্তাক)। পরে তোয়াহার সাম্যবাদী দল থেকে বেরিয়ে গিয়ে মাহবুব ভূইয়া পৃথক দল 'জনশক্তি পার্টি' গঠন করেন। অন্যদিকে বাংলাদেশের মজদুর পার্টি ও আবুল বাশার ও দেবেন শিকদারের নামে দুভাগে বিভক্ত হয়।[21]

বাংলাদেশের রাজনীতি গভীরভাবে ব্যক্তি কেন্দ্রিক নেতৃত্ব ও ক্যারিজমা দ্বারা প্রভাবিত। এ ধরনের নেতৃত্ব বাংলাদেশের রাজনীতিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানের পথে বাধার সৃষ্টি করেছে। ১৯৪৭ সনে পাকিস্তান সৃষ্টির পর দেশ পরিচালনার সর্বক্ষেত্রে জিন্নার ক্যারিজমা যুক্ত নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে শুরুতে পাকিস্তানে গণতন্ত্র হুমকীর সম্মুখীন হয়। গণতন্ত্রের পরিবর্তে বরং সেখানে 'ভাইস রিগ্যাল পদ্ধতি' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।[22] একইভাবে শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর প্রচন্ড ক্যারিজমা নিয়ে জাতীয় নেতৃত্বে আসীন হয়েছিলেন। তাঁর প্রভাবেই আওয়ামী লীগ ঐ অবস্থা থেকে

---

২১। হায়দার, আকবর খান, 'বাম রাজনীতি সংকট ও সমস্যা', গণমুক্তি প্রকাশনা, ঢাকা, ১৯৮৩।

২২। K.B. Sayeed, "Pakistan: The formative phase, Karachi, Pakistan publishing House, 1960.

Dhaka University Institutional Repository



সর্বক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে । দলের আদর্শ কর্মসূচী, নিয়ম-নীতি, সাংগঠনিক শৃঙ্খলা এবং দলীয় সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে মুজিবের ব্যক্তিগত প্রাধান্য ছিল অত্যাধিক । ফলে সাংগঠনিক প্রক্রিয়ায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের চেয়ে নেতার উপর আস্থা স্থাপন ও আনুগত্য প্রদর্শনের উপরই অধিক গুরুত্ব দেয়া হতো । ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সনের মধ্যে আওয়ামী লীগে নানা কারণে উপদলীয় কোন্দল দেখা দেয় । এর মধ্যে তাজউদ্দীন আহমদ গ্রুপ এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম খন্দকার মোশতাক আহমদ গ্রুপের কোন্দল, মিজানুর রহমান চৌধুরীর উপদলীয় মনোভাব, আবদুর রাজ্জাক ও তোফায়েল আহমদের মধ্যে দ্বন্দ্ব, শেখ ফজলুল হক মনি ও আব্দুল মান্নানের 'শুদ্ধি অভিযান' কর্মসূচী গ্রহণে রাজ্জাক তোফায়েলের ক্ষোভ ইত্যাদি সমস্যার প্রেক্ষিতে শেখ মুজিবের ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপ, আওয়ামী লীগের ঐক্য বজায় রাখে ।[৭] এ সকল ক্ষেত্রে দলীয় সংগঠন কোন কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেনি, ফলে ১৯৭৫ সনে সামরিক অভ্যুত্থানে শেখ মুজিব নিহত হলে দলে কোন্দল ও উপদলীয় বিরোধের কারণে ভাংগন চূড়ান্ত আকার ধারন করে । খন্দকার মোশতাকের নেতৃত্বে ডেমোক্রেটিক লীগ, মিজানুর রহমান চৌধুরীর, মাওলানা তর্কবাগীশের গণ আজাদী লীগ, এবং আবদুর রাজ্জাকের বাকশাল গঠন এক্ষেত্রে উদাহরণ ।

সংক্ষেপে আমি বাংলাদেশের রাজনৈতিক কৃষ্টির বিবরণ তুলে ধরেছি । পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে দল ভাংগনের তাত্ত্বিক কারণগুলো একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দল অর্থাৎ আওয়ামী লীগের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে দলভাংগানোর কারণগুলো বিশ্লেষণ করবো । একই সংগে দলভাংগনে তত্ত্বগুলি কতটুকু প্রয়োজ্য তাও পর্যালোচনা করবো । যদিও আমি দলভাংগনের কারণগুলি বিশ্লেষন এ একটি সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগকে নির্বাচন করেছি তথাপি এই গবেষণায় আমি স্বাধীনতাপূর্ব ও স্বাধীন ভাবে বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ ব্যতীত অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সার্বিক বিরোধ ও ভাংগনের প্রক্রিয়ার কারণ সমূহের দিকে লক্ষ রেখেছি ।

---

২০। Rounaq Jahan, "Bangladesh 1973: Management of Factional polit in Jahan, Bangladesh polotics: problems and issues, Dhaka: University press Ltd.1980, PP - 79-92.

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

## আওয়ামী লীগ :- উৎপত্তি, কর্মসূচী ও লক্ষ্য ।

১৯৪৯ সনের ২৩শে জুন "পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলীম লীগ" নাম নিয়ে বর্তমান বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মূল সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ।

সরকার কিংবা মুসলীম লীগের যে কোন প্রকার বিরোধিতাকে সে সময় রাষ্ট্রদ্রোহিতা এবং ভারতের অনুচরবৃত্তি হিসেবে চিহ্নিত করা হতো। ফলে পাকিস্তানে তখন পর্যন্ত একমাত্র বিরোধী দল হলেও হিন্দু প্রধান ন্যাশনাল কংগ্রেসের পক্ষে ফলপ্রসূ কোন অবদান রাখা সম্ভব হয়নি। অপরদিকে প্রাদেশিক নেতৃত্বে ছিল খাজা নাজিমুদ্দীন ও মওলানা আকরাম খাঁর মত কেন্দ্রের অনুগত নেতাদের হাত, যারা আসাম মুসলীম লীগের সভাপতি মাওলানা ভাসানীকেও দলের প্রাথমিক সদস্য পদ দিতে সম্মত হয়নি।[১]

একই সংগে অবশ্য পূর্ব বাংলায় সরকার বিরোধিতারও বিকাশ ঘটেছিল। টাংগাইলের উপনির্বাচনে মাওলানা ভাসানী ও শামসুল হক মুসলীম লীগ প্রার্থীকে পরাজিত করেন, ছাত্রদের উদ্যোগে ভাষা আন্দোলন গড়ে উঠে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা ধর্মঘট পালন করতে থাকেন। এইরূপ বিচ্ছিন্নভাবে চলমান আন্দোলন গুলোকে সমন্বিত ও সংহত করবার মাধ্যমে বৃহত্তর গণ আন্দোলন পরিচালনার তাগিদই সে সময় একটি রাজনৈতিক দল গঠনের বিস্তৃত ক্ষেত্র নির্মান করেছিল ।

এই সময় পূর্ব বাংলা ব্যবস্থাপক সভায় বাজেটের উপর বিতর্কে মাওলানা ভাসানী বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, "স্বাধীন দেশে স্বাধীন পাকিস্তানে ফেডারাল পাওয়ারের মন্ত্রী দ্বারা বাজেট পেশ হবে তা আমরা কখনও আশা করিনি,, জনসাধারণের সংগে তাঁর আদৌ কোন সংস্রব নাই। তিনি গভর্নরজেনারেলের এর প্রেরিত প্রতিনিধি, জন সাধারণের সংগে তাঁর মনের কোন মিল নাই। তাই তিনি যে বাজেট পেশ করেছেন তাতে আমলাতান্ত্রিকদের ভোগবিলাসের জন্য সব কিছুই করেছেন, কিন্তু দেশের মেরুদন্ড কৃষক মজুর যারা দিবারাত্রি হাড়ভাংগা খাটুনি খেটে রাজস্ব যোগায় তাদের জন্য কিছুই করেন নাই । শতকরা ৪ জন লোক শহরে বাস করে তাদের পানীয়

---

১। অলি আহাদ - জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে '৭৫, বর্ণরুপা মুদ্রায়ন, ঢাকা, ১৯৭৮, পৃঃ ৯৮
——আতাউর রহমান খানের সংগে সাক্ষাৎকার গ্রহণ, ২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮৮

Dhaka University Institutional Repository


জনের জন্য কোন ব্যবস্থা করেননি । যুক্ত বংগে (১৯৪৩-'৪৪) পুলিশ খাতে ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছিল ৩ কোটি ২ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা আর আমাদের মাননীয় অর্থ সচিব যে বাজেট উপস্থিত করেছেন তাতে কেবল পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পুলিশের খাতে ব্যয় বরাদ্দ করেছেন ৩,০৩,৭৭,০০০ টাকা । পুলিশের ব্যয় বৃদ্ধি করে স্বাধীন পাকিস্তানে কথা বলার চেষ্টা অত্যন্ত লজ্জাকর বিষয় " ।[২]

১৯৪৮ সন থেকে রাষ্ট্রভাষাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে বিরাট আন্দোলন । পূর্ব বাংলার সর্বস্তরের জনগণের কাছে থেকে উঠে প্রতিবাদ । ছাত্র সমাজ সহ রাজনৈতিক দলগুলো এর বিরুদ্ধে সদস্যবৃন্দ সরকারী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি উত্থাপন করে এবং বাঙালীদের দাবী বিবেচনার আহবান জানায় ।[৩]

এই পটভূমির প্রেক্ষিতে ১৯৪৯ সনের মাঝামাঝি সময়ে ঢাকার ২৫০ নম্বর মোগলটুলীতে এককর্মী শিবিরে শওকত আলী একটি সম্মেলনের আহবান জানান । কর্মী সম্মেলনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন খন্দকার মোস্তাক আহমদ ।

কাজী বশিরের রোজ গার্ডেনের বাসভবনে ২৩ ও ২৪ জুন ১৯৪৯ সনে কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় । মাওলানা ভাসানীর আহবানে রাজনৈতিক কর্মী সম্মেলনের মধ্য দিয়ে গঠিত হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলীম লীগ ।[৪]

---

২। প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা, ১২শে মার্চ ১৯৪৮ সন, মওলানা ভাসানী প্রদত্ত ভাষনের কিছু অংশ । তথ্য মন্ত্রণালয় প্রকাশিত বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিল পত্র, ১ম খন্ড, ১৯৮২, সম্পাদক : হাসান হাফিজুর রহমান ।

৩। ইত্তেহাদ, ২০ জুলাই ১৯৪৮, শিরোনাম : রাষ্ট্রভাষা বাংলার স্বপক্ষে একটি নিবন্ধ
- দৈনিক আজাদ, ফেব্রুয়ারী ২১-২৮, ১৯৫২, শিরোনাম : ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারী ভাষা আন্দোলনের ঘটনাবলী ।
- বদরুদ্দীন উমর, ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, প্রথম খন্ড, ১৯, পৃঃ ৬২
- সাপ্তাহিক নও বেলাল, মার্চ ৪, ১৯৪৮, শিরোনাম : রাষ্ট্রভাষা

৪। M. Ratique Afzal: Polotical Parties in Pakistan 1947-58 P. 56 Islamabad, 1976.

Dhaka University Institutional Repository

আওয়ামী মুসলীম লীগের প্রথম ম্যানিফেষ্টো :

পূর্ব পাকিস্তান মুসলীম লীগ কর্মী সম্মেলন বিবেচনার জন্য শামসুল হক 'মুলদাবী' নামে একটি ছাপা পুস্তিকাতে লিপিবদ্ধ তার বক্তব্য পাঠ করেন । প্রারম্ভে তিনি বলেন, " ইংরেজী ১৯৪৯ সনের ২৩শে ও ২৪শে জুন তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত " পূর্ব পাকিস্তান মুসলীম লীগ কর্মী সম্মেলন মনে করে যে, সর্বকালের সর্ব যুগের, সর্ব দেশের যুগ প্রবর্তক ঘটনাবলীর ন্যায় লাহোর প্রস্তাব ও একটা নতুন ইতিহাসের সৃষ্টি করিয়াছে । ভারতের মুসলমানগণ বহু শতাব্দীর সঞ্চিত অভিজ্ঞতা থেকে এই মহা সত্য উপলব্ধি করিয়াই বিরুদ্ধ পরিবেশে বা দারুল হরবের পরিবর্তে ইসলামীক পরিবেশ বা দারুল ইসলাম কায়েম করবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিল । কিন্তু পাকিস্তান ইসলামী রাষ্ট্র হইলেও শুধু মুসলমানদের রাষ্ট্র বা শুধু মুসলমানের জন্য প্রতিষ্ঠিত করিবার এবং পাশ্চাত্য সভ্যতা ও শিক্ষা প্রভাবিত ইসলাম বিরোধী সাম্রাজ্যবাদী, ধনতান্ত্রিক ও আত্মকেন্দ্রিক পরিবেশ গড়িয়া তুলিবার ইচ্ছা তাদের ছিল না, কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্তমান সংকট লীগ নেতৃবৃন্দ উপরোক্ত কর্মপন্থা অনুসরণ না করে তাঁদের নিজেদের কায়েমী স্বার্থ এবং প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্বে বজায় রাখার জন্য লীগের মর্যাদা ও জনপ্রিয়তা ভাংগাইয়া চলিয়াছে । এই উদ্দেশ্যেই তাহারা মুসলীম লীগকে দলবিশেষের প্রতিষ্ঠান করিয়া ফেলিয়াছে শুধু তাহাই নয় মানবের প্রতি আশীর্বাদ স্বরূপ ইসলামকেও ব্যক্তি, দল ও শ্রেণী বিশেষের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য অন্যায় এবং অসাধুভাবে কাজে লাগানো হইতেছে । কোনও পাকিস্তান প্রেমিক এমন কি মুসলীম লীগের বহু কর্মী পর্যন্ত নীতি ও কর্মসূচী সম্পর্কে কোনরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করিতে অথবা প্রস্তাব করিতে পারে না । কেহ যদি এইরূপ করিবার চেষ্টা করে তাহা হইলে তাহাদিগকে পাকিস্তানের শত্রু বলিয়া আখ্যায়িত করা হয় ।"[৫]

অনেক আলাপ আলোচনার পর মাওলানা ভাসানীর আহবানে রাজনৈতিক কর্মী সম্মেলনের মধ্য দিয়ে গঠিত হলো 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলীম লীগ' । একই সংগে নিম্নলিখিত নেতৃবর্গসহ চল্লিশ সদস্য বিশিষ্ট অর্গানাইজিং কমিটি গঠিত হয় ।

---

৫। শামসুল হকের 'মুলদাবী' ২৪ জুন, ১৯৪৯ , দ্রষ্টব্যঃ বদরুদ্দীন 'পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, প্রথম খন্ড, ২য় সংস্করণ, এপ্রিল, ১৯৭৯, পৃষ্ঠা - ২৪১-৪৫ ।

Dhaka University Institutional Repository

| | | |
|---|---|---|
| মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী | ... | সভাপতি |
| সাখাওয়াৎ হোসেন | ... | সহ-সভাপতি |
| আলী আহমদ খান | ... | সহ-সভাপতি |
| আতাউর রহমান খান | ... | সহ-সভাপতি |
| শামসুল হক | ... | সাধারণ/সম্পাদক |
| শেখ মুজিবর রহমান | ... | যুগ্ম সম্পাদক |
| খন্দকার মোস্তাক আহমদ | ... | সহ সম্পাদক |
| এ,কে,এম, রফিকুল হোসেন | ... | সহ সম্পাদক |
| ইয়ার মোহাম্মদ খান | ... | কোষাধ্যক্ষ |

১৯৪৯ সনের ২৫শে জুন অপরাহ্নে সরকারী লীগের হুমকি ও হামলা উপেক্ষা করে আরমানীটোলা ময়দানে মাওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে নব গঠিত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলীম লীগের প্রথম প্রকাশ্য সভা অনুষ্ঠিত হয় ।[৬]

দলের গঠনতন্ত্র, কর্মসূচী, লক্ষ্য, প্রস্তাবনা ও দলীয় সাংগঠনিক কাঠামো সম্বলিত দলীয় সংবিধান বিস্তারিত আলোচনায় রচিত হয় ।

প্রস্তাবনা :

সর্ব ভারতীয় মুসলীম লীগ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছে এবং এর লক্ষ্য ছিল পাকিস্তান অর্জন । পরবর্তীতে পাকিস্তানের মুসলমানগণ তাই এই দলটিকেই সর্বভারতীয় মুসলীম লীগের উত্তরাধিকারী হিসাবে সমর্থন জানিয়েছে । কিন্তু দিন অতিবাহিত হবার সংগে সংগে তাহাদের সে ধারনার পরিবর্তন হয়েছে । তাদের কাছে এটা পরিস্কার হয়ে যায় যে, এই দলটির একমাত্র লক্ষ্য মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করে, ক্ষমতার ব্যবহার এবং অবশ্যই এককোটি জনগণের কাছে পার্টি হিসাবে জনপ্রিয়তাকে ধরে রাখা নয় । প্রকৃতপক্ষে যারা স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছে তারা আজ এই সংগঠনে প্রবেশের অধিকার পাচ্ছে না বরং পাকিস্তান বিরোধী এবং সুবিধাবাদী কিছু মুসলীম লীগার রাতারাতি স্বাধীন মুসলীম লীগ গঠন করে ফেলেছে ।

---

৬। আলী আহাদ, জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে '৭৫,-প্রকাশক সাইদ হাসান, ঢাকা পৃষ্ঠা - ১০২ ।

Dhaka University Institutional Repository



দেশের বিরাজমান প্রকৃত জরুরী সমস্যাগুলির সমাধান না করে এবং দুঃস্থ জনগণের পূর্নবাসনের কোন চেষ্টা না করে বরং সরকারী যন্ত্রে পরিনত হয়েছে এবং সরকারী লীগে পরিনত হয়েছে । বিভিন্ন নিরাপত্তা বিধিও ধারার এর মাধ্যমে বিরোধী কণ্ঠকে স্তব্ধ করে রাখা হচ্ছে যারা জনগণের বৈধ ও প্রকৃত অধিকার নিয়ে কথা বলেছে তাদের উপর ।

দেশ প্রকৃত অর্থে উন্নয়নের দিকে মুসলীম লীগের মনোভাবের জন্য জগিয়ে যেতে পারছে না । শিক্ষা ব্যবস্থা ব্যাহত হচ্ছে, উদ্বাস্তুদের পূর্নবাসন হয় নাই, শিল্পের উন্নয়ন হয় নাই, দুই বৎসর যাবত শূন্য আসন গুলিতে উপ নির্বাচন হচ্ছে না । প্রশাসনের প্রত্যেকটিই স্তরের মানের অবনতি হয়েছে । একই সংগে 'নিরাপত্তা বিধি" এর তালিকা দিন দিন বৃদ্ধি করা হচ্ছে ।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে জনমতের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে এবং দরিদ্র জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি আনায়নের লক্ষ্য সাধারণ মানুষের জন্য একটি সংগঠন গড়ে তুলবার জন্য প্রস্তাব করা হচ্ছে । সাধারণ মানুষের সংগঠন আওয়ামী মুসলীম লীগ সকল ক্ষেত্রে একটি সম্পূর্ন পৃথক সংগঠন হিসেবে 'সরকারী লীগ' বা 'পকেট লীগ' থেকে তার স্বাতন্ত্র বজায় রাখবে ।[৭]

উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য :

(১) পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব, একতা সংহতি , মর্যাদা এবং স্থিতিশীলতা রক্ষা করা হইবে

(২) পাকিস্তানের সংবিধান এবং আইন প্রকৃত গণতন্ত্রের নীতি সমূহের উপর ভিত্তি করে প্রনয়নের নিশ্চয়তা দেওয়া হইবে ।

(৩) পাকিস্তানে মুসলমানদের ধর্ম শিক্ষা এবং সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষন করা হইবে এবং একই অধিকার অগ্রাধিকার অমুসলিম নাগরিকদের ভোগ করিবার নিশ্চয়তা বিধান করা হইবে ।

(৪) পাকিস্তানের প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক চাহিদাসমূহ, বিশেষতঃ খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, বাসস্থান এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা সংরক্ষিত হইবে এবং সৎ উপার্জন এবং সম্মান জনক আয়ের সুযোগ করিয়া দেওয়া হইবে ।

(৫) সর্ব সাধারনের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের জন্য প্রচেষ্টা চালানো হইবে এবং শ্রমের প্রকৃত মুল্য প্রদান করা হইবে ।

---

৭। 'Draft constituion and Rules of the East pakistan Awami Muslim Legue,'1950.

Dhaka University Institutional Repository



(৬) পারস্পারিক সাহায্য এবং সহযোগিতার মাধ্যমে সমাজে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করিয়া সামাজিক সমতা কায়েম করিতে হইবে ।

(৭) বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ হইতে পৃথক করিয়া বিচার বিভাগের স্বাধীনতা দিতে হইবে ।

(৮) মৌলিক অধিকার সমূহ যেমন পৃথক এবং যৌথভাবে বিশ্বাসের স্বাধীনতা, প্রকাশের স্বাধীনতা, প্রতিষ্ঠান এবং সংগঠন গড়িয়া তুলিয়া স্বাধীনতা সংরক্ষন করিতে হইবে ।

(৯) বিশ্বের সমগ্র মুসলিমদের সহিত ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক বৃদ্ধি ও শক্তিশালী করিতে হইবে এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহ সহ বিশ্বের মুসলিম প্রধান রাষ্ট্রগুলির সংগে অর্থনৈতিক সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব-পূর্ন সম্পর্কের ভিত্তিকে জোরদার করিতে হইবে ।

তাৎক্ষনিক কর্মসূচী :

(১) ক্ষতিপূরণ প্রদান ব্যতিরেকেই জমিদারী প্রথার বিলোপ সাধন করে উদ্বৃত্ত জমি ভূমির প্রকৃত চাষীদের মধ্যে বন্টন করিতে হইবে ।

(২) ভিক্ষা বৃত্তির অভিশাপ দুর করিবার উদ্দেশ্যে কর্মশালা প্রতিষ্ঠা করতে হইবে এবং এতিমদের প্রকৃত নাগরিক হিসাবে গড়িয়া তুলিবার জন্য প্রকৃত শিক্ষাদান ব্যবস্থার প্রবর্তন করিতে হইবে ।

(৩) জাতির বৃহত্তর স্বার্থে প্রধান শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিকে জাতীয়করণ করা হইবে এবং সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় কুটির শিল্প সহ অপরাপর শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির বিস্তৃতি ঘটাইতে হইবে এবং সংগঠিত করিতে হইবে ।

(৪) অবৈতনিক ও বাধ্যতা মূলক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে হইবে এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা আধুনিক এবং বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে গড়িয়া তুলিতে হইবে ।

(৫) প্রশাসন এবং সমাজ জীবনের প্রতিটি স্তর হইতে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার এবং সকল প্রকার অসামাজিক অভিশাপ দুর করিতে হইবে ।

(৬) অতি জরুরী ভিত্তিতে মোহাজেরদের পুনর্বাসন করিবার পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে এবং তাহাদের একই সংগে কর্মক্ষম নাগরিক হিসাবে তৈরী হওয়ার সুযোগ করিয়া দিতে হইবে ।

(৭) রাষ্ট্রের প্রকৃত স্বার্থে সুর্ণসূত্র নামে খ্যাত "পাট" এর পূর্ন সুদব্যবহার করিতে হইবে এবং এর জন্য ব্যাপক সংখ্যক কল কারখানা এবং বাজার সৃষ্টি করিতে হইবে ।

Dhaka University Institutional Repository



(৮) রাষ্ট্রের সর্বত্র সরকারেকে অবৈতনিক চিকিৎসালয় স্থাপন করিতে হইবে

(৯) কেন্দ্র এবং প্রদেশগুলির মধ্যে সকল প্রকার রাজস্ব ব্যয় ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে নির্বাচন করিতে হইবে।

(১০) প্রশাসনিক কাঠামো থেকে [illegible] বাহুল্য ব্যয় দূর করিতে হইবে ।

(১১) রাস্তাঘাট, রেলপথ এবং নৌযানের উন্নয়ন সাধন করিয়া যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি সাধান করিতে হইবে ।

## গঠন প্রণালী :

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হইবে নিম্ন লিখিত ভাবে :-

১। প্রাদেশিক আওয়ামী মুসলীম লীগের বিশেষ অধিবেশন এবং বাৎসরিক অধিবেশন হবে ।

২। আওয়ামী মুসলীম লীগের কাউন্সিল গঠিত হবে ।

৩। প্রাদেশিক আওয়ামী মুসলীম লীগের কার্যনির্বাহী কমিটি গঠিত হবে ।

৪। জেলা আওয়ামী মুসলীম লীগ [illegible] গঠিত হবে ।

৫। এর পরের সুর মহকুমা ও নগর আওয়ামী লীগ

৬। সর্বশেষে প্রাথমিক লীগ ।

## আওয়ামী মুসলীম লীগের সদস্যপদ :

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলীম লীগের প্রাথমিক সদস্যপদ লাভের জন্য প্রত্যেকের জন্য যা প্রযোজ্য তা হলো :- (ক) মুসলমান হতে হবে, (খ) পূর্ব বাংলার নাগরিক হবেন, (গ) ১৮ বৎসরের নিম্নে তার বয়স হবে না ।

প্রাথমিক সদস্য পদ লাভের জন্য নারী পুরুষ প্রত্যেকেই একটি লিখিত আবেদন পত্র উপরোক্ত শর্তগুলি পূরণ সাপেক্ষে ঘোষনা করবেন যে তারা আওয়ামী মুসলীম লীগের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এর সদস্য পদ লাভে ইচ্ছুক । পরের বৎসর তাকে অস্থায়ী সদস্য হিসাবে গ্রহণ করা হবে । কিন্তু কোন কারণে এই সদস্য পদ নবায়ন করা না হলে তিনি পরের বৎসরের ঠিক দুই মাসের মধ্যে তার সদস্য পদ হারাবেন ।

## পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলীম লীগের কর্মকর্তাগণ :

১। সভাপতি - ১ জন

Dhaka University Institutional Repository


| | | | |
|---|---|---|---|
| ২। | সহ-সভাপতি | - | ৫ জন |
| ৩। | অবৈতনিক সাধারণ সম্পাদক | - | ১ " |
| ৪। | অবৈতনিক কোষাধ্যক্ষ | - | ১ " |
| ৫। | স্থায়ী সম্পাদক | - | ১ " |
| ৬। | যুগ্ম সম্পাদক | - | ৩ " |

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলীম এর কাউন্সিল অধিবেশনের প্রথম সভায় এর স মধ্য থেকে কর্মকর্তাগণ নির্বাচিত হবেন । তবে বার্ষিক অধিবেশনের পূর্বে প্রত্যেক জেলা প থেকে নির্বাচিত সদস্যরা কাউন্সিল গঠন করবেন এবং তার পর বার্ষিক কাউন্সিল অধিবে অনুষ্ঠিত হবে । পরবর্তী নির্বাচনের পূর্ব পর্যন্ত প্রত্যেকেই স্বীয় পদে বহাল থাকবেন তবে হলে পুনঃ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারবে ।

আওয়ামী লীগের তহবিল :

(ক) প্রাইমারী লীগের তহবিল, অনুদান এবং কর্মকর্তাদের বার্ষিক চাঁদার সমন্বয়ে গড়ে উঠবে ।

(খ) মহকুমা এবং নগর পর্যায়ে আওয়ামী লীগের তহবিল গঠিত হবে, মহকুমা আওয়ামী লীগ সদস্যদের বার্ষিক আট টাকা চাঁদা, প্রত্যেক সদস্যের ২ টাকার সদস্যপদ চাঁদা অনুদানের সমন্বয়ে ।

(গ) জেলা পর্যায়ের তহবিল, ও অনুদান এবং বার্ষিক চাঁদার সমন্বয়ে গড়ে উঠবে ।

(ঘ) কেন্দ্রীয় পাকিস্তান আওয়ামী মুসলীম লীগ এর তহবিল গঠিত হবে প্রত্যেক স সদস্যের ২ টাকা চাঁদা অনুদান এবং জেলা সংযুক্তির ৩০ টাকা ফিস এর সমন্বয়ে ।

উপরোক্ত আদর্শ, নীতি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলীম লীগ গড়ে উঠার পর এর নেতৃবৃন্দ দেশবাসীকে রাজনৈতিক ভাবে সচেতন করবার নিমিত্তে সমগ্র দেশব্যাপী অবিরাম কর্মীসভা ও জনসভা অনুষ্ঠিত করছিলেন । যদিও মুসলীম লীগ ও মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমীন সরকার কোথাও ১৪৪ ধারা জারী করে আবার কোথাও আওয়ামী লীগের কর্মসূচী পালনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে থাকে তথাপি জনতা মাওলানা ভাসানী নেতৃত্বে অবিচল আস্থা জ্ঞাপন করে একমঞ্চে আওয়ামী মুসলীম লীগের পতাকাতলে সমবেত হতে থাকে । এইভাবে আওয়ামী লীগ কর্মী ও নেতাদের পরিশ্রম ও ত্যাগে পূর্ব পাকিস্তানের ঘরে ঘরে

Dhaka University Institutional Repository


আওয়ামী মুসলীম লীগের বাণী পৌঁছাতে থাকে ।

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ অফিস ৯৪ নবাবপুর রোডে স্থানান্তরিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত জনাব ইয়ার মোহাম্মদ খানের বাড়ী ১৮ নং কারকুন বাড়ী লেনেই নবগঠিত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলীম লীগের সদর দপ্তর ছিল ।

ইত্তেফাকের প্রতিষ্ঠা :

যেহেতু তদানীন্তন দৈনিক পত্রিকাগুলি সরকার বিরোধী সংগঠনের সংবাদ প্রকাশ করতো না, সেহেতু মাওলানা ভাসানী সাপ্তাহিক ইত্তেফাক প্রকাশের সংকল্প নিলেন, কিন্তু সরকারী হামলার ভয়ে মুদ্রনালয়গুলি সাপ্তাহিক ইত্তেফাক ছাপাতে অস্বীকার করে । সুতরাং পত্রিকাটির মুদ্রনালয় পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দেয় । পুনঃ সরকারী অনুমতি প্রার্থনাকালে মজলুম নেতা মওলানা ভাসানীর স্থলে জনাব ইয়ার মোহাম্মদ খান সাপ্তাহিক ইত্তেফাকের প্রকাশক ও মুদ্রাকারক হলেন । প্যারামাউন্ট প্রেস থেকে পত্রিকাটি অতঃপর প্রকাশিত হতে থাকে ।[৮]

আওয়ামী মুসলীম লীগের অসাম্প্রদায়িকরণ :

১৯৫৫ সালের ২১, ২২ ও ২৩ শে অক্টোবর সদরঘাটে অবস্থিত 'রুপমহল' সিনেমা হলে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলীম লীগের তিন দিবস ব্যাপী দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় । উক্ত অধিবেশনের সুদূর প্রসারী গুরুত্বপূর্ন অবদান হলো সংগঠন এর দ্বার জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের জন্যই উন্মুক্ত করা । যেহেতু শহীদ সোহরাওয়ার্দী অসাম্প্রদায়িকী-করণের ঘোর বিরোধী ছিলেন । পক্ষান্তরে সংগীদের সাম্প্রদায়িক চরিত্র পরিবর্তনের প্রবক্তা ছিলেন মাওলানা ভাসানী পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলীম লীগ এর সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান, জনাব সোহরাওয়ার্দীর অন্ধ সমর্থক হওয়া সত্ত্বেও এর বিরুদ্ধাচরন করতে ইতস্ততঃ করছিলেন । অবশেষে ২২শে অক্টোবর রাত্রি প্রায় ৪ টার দিকে সোহরাওয়ার্দী তাঁর আপত্তি প্রত্যাহার করলে প্রতিষ্ঠানকে অসাম্প্রদায়িক করা স্থির হয় ।[৯] উক্ত সুদূর প্রসারী ও গভীর সম্ভাবনাময় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে অনাগত ভবিষ্যতের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে এক শুভ মৌলিক গণতান্ত্রিক সৌভ্রাতৃমূলক পরিবেশ সৃষ্টির গোড়াপত্তন ঘটে ।

---

৮। আবুল মনসুর আহমদ , 'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর' ৩য় মুদ্রন, ১৯৭৫ , পৃঃ
৯। অলি আহাদ- জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে '৭৫ , খোশরোজ কিতাব মহল নয়, ... 

Dhaka University Institutional Repository



১৯৫৫ সালের ২১, ২২ ও ২৩ অক্টোবর দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশনে নিম্নলিখিত কর্মকর্তাগণ নির্বাচিত হন :-

| | | |
|---|---|---|
| মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী | - | সভাপতি |
| আতাউর রহমান খান | - | সহ-সভাপতি |
| আবুল মনসুর আহমদ | - | সহ-সভাপতি |
| খয়রাত হোসেন | - | সহ-সভাপতি |
| শেখ মুজিবর রহমান | - | সাধারণ সম্পাদক |
| অলি আহাদ | - | সাংগঠনিক সম্পাদক |
| অধ্যাপক আব্দুল হাই | - | প্রচার সম্পাদক |
| আব্দুস সামাদ | - | শ্রম সম্পাদক |
| তাজউদ্দিন আহমদ | - | সাংস্কৃতিক ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদক |
| সেলিনা বানু | - | মহিলা সম্পাদিকা |
| মোহাম্মদ উল্লাহ | - | অফিস সম্পাদক |
| ইয়ার মোহাম্মদ খান | - | কোষাধ্যক্ষ |

সভাপতি ভাসানী নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরূপে মনোনয়ন দান করেন।

১। জহুর আহমদ চৌধুরী (চট্টগ্রাম) ২। আবদুল আজিজ (চট্টগ্রাম
৩। আহসাব উদ্দীন আহমদ(চট্টগ্রাম) ৪। আবদুল জব্বার খদ্দর(সিলেট)
৫। আবদুল বারী (ব্রাহ্মনবাড়ীয়া) ৬। রফিক উদ্দিন ভুইয়া (ময়মনসিংহ)
৭। হাতেম আলী খান(টাংগাইল) ৮। আবদুল হামিদ চৌধুরী (ফরিদপুর)
৯। সৈয়দ আকবর আলী (সিরাজগঞ্জ) ১০। শেখ আবদুল আজিজ(খুলনা)
১১। শামিন উদ্দিন আহম্মদ(খুলনা) ১২। মফিউর রহমান(যশোর)
১৩। শাদ আহমদ (কুষ্টিয়া) ১৪। তহুর আহমদ চৌধুরী (রাজশাহী)
১৫। কাজী গোলাম মাহবুব (বরিশাল) ১৬। মনসুর আলী (পাবনা)
১৭। আমজাদ হোসেন (পাবনা) ১৮। মাজহারুদ্দিন আহমাদ (রংপুর)
১৯। আলতাফ হোসেন (ময়মনসিংহ) ২০। রহিম উদ্দিন আহমদ (দিনাজপুর)

Dhaka University Institutional Repository

২১। আমিনুল হক চৌধুরী (বরিশাল) ২২। আকবর হোসেন আকন্দ (বগুড়া)

২৩। দবির উদ্দীন আহমদ (নীলফামারী) ২৪। পীর হাবিবুর রহমান (সিলেট)

২৫। কামরুদ্দীন আহমদ (ঢাকা)।[১০]

১৯৫৮ সনে সামরিক শাসন জারী ও ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট গঠন :

১৯৫৮ সনের ৭ই অক্টোবর পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল ইসকান্দার মীর্জা সমগ্র পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারী করেন। তিনি তাঁর বক্তৃতার এক জায়গায় বলেন, "আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি যে :-

১। ২৩শে মার্চ ১৯৫৬ সনের রচিত সংবিধান বাতিল হয়ে যাবে।

২। তাৎক্ষনিক ফলাফল হিসেবে কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকার গণ পদচ্যুত হবেন।

৩। কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ এবর প্রাদেশিক আইন পরিষদগুলি রচিত হয়ে যাবে।

৪। রাজনৈতিক দলগুলি বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

৫। অপর-কোন ব্যবস্থাগ্রহণ না করা পর্যন্ত, পাকিস্তানে সামরিক শাসন চালু থাকবে, আমি এ পরিস্থিতিতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল আইয়ুব খানকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসাবে নিয়োগ করছি এবং পাকিস্তানের সকল সামরিক বাহিনীকে তার নির্দেশের অধীনে স্থাপন করছি।"[১১]

তবে এর মাত্র ২০ দিন পর অর্থাৎ ২৭শে অক্টোবর ১৯৫৮ সনে আইয়ুব খান, ইস্কান্দার মীর্জাকে ক্ষমতা চ্যুত করে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ১৯৫৮ সালের অক্টোবর থেকে ১৯৬২ সালের জুন মাস পর্যন্ত সমগ্র পাকিস্তানে সামরিক আইন বলবৎ থাকায় রাজনৈতিক দলগুলি নিষিদ্ধ হলে আওয়ামী লীগও নিষিদ্ধ হয়ে পড়ে। এই সময়ের মধ্যে সোহরাওয়ার্দীসহ আবুল মনসুর, শেখ মুজিবর রহমান, হামিদুল হক চৌধুরী, আসগর আলী শাহ এবং আমিনুল ইসলাম চৌধুরীকে গ্রেফতার করা হয়।[১২]

---

১০। অলি আহাদ – জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে '৭৫, বর্ণরূপা মুদ্রায়ন, ঢাকা, পৃঃ ২৩৭-২৩৮

১১। সামরিক আইনজারী ও জেনারেল মীর্জা কর্তৃক ক্ষমতা দখল, সূত্র : সরকারী দলিল, তারিখ : ৭ই অক্টোবর ১৯৫৮।

১২। তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া ( 'পাকিস্তানী রাজনীতির বিশ বছর' প্রথম প্রকাশ ১মে, ১৯৮১, পৃষ্ঠা – ৯৫ ।

Dhaka University Institutional Repository



১৯৬২ সালের ১লা জুন আইয়ুবের নির্দেশিত ও ঘোষিত পাকিস্তান এর দ্বিতীয় শাসন তন্ত্র কার্যকর হয় । তখন থেকে সামরিক আইনের বিলুপ্তি হয় । ১৯৬২ সালের ২৪শে জুন ৯ জন নেতা সর্বজনাব নুরুল আমীন, আতাউর রহমান খান, হামিদুল হক চৌধুরী, বাবু হোসেন সরকার, মাহমুদ আলী , শেখ মুজিবর রহমান, ইউসুফ আলী চৌধুরী, পীর মোহসীন উদ্দীন প্রমুখ সংবিধানের তীব্র সমালোচনা করে এক যুক্ত বিবৃতি প্রদান করেন যা 'নয় নেতার বিবৃতি' নামে বহুল প্রচারিত ।[১৩]

১৯৬২ সালের ১৫ই জুলাই আইয়ুব খান "রাজনৈতিক দল আইন" জারি করেন এবং কতকগুলি বাধা নিষেধ সাপেক্ষে দলগুলিকে রাজনৈতিক কার্যকলাপ শুরু করবার অনুমতি দেন । এদিকে ৬ মাস ২০ দিন পর জেল থেকে রুগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে সোহরাওয়ার্দী মুক্তি পেলেন এবং প্রথমে তিনি ভর্তি হলেন করাচীর জিন্নাহ্ হাসপাতালে । সুস্থ হবার পর তিনি ঢাকায় এলেন ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯৬২ তে । ঢাকা বিমান বন্দরে ঐদিন দলমত নির্বিশেষে সকল নেতা কর্মী আর লক্ষ লক্ষ জনগণ তাকে সম্বর্ধনা জানালেন উপস্থিত থেকে । এ সময় দলমত নির্বিশেষে ৯ নেতা একত্রিত হয়ে গঠন করলেন জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট বা নেতারা এই ফ্রন্ট গঠন করে আইয়ুবের অগণতান্ত্রিক সংবিধানের বিরুদ্ধে জোর আন্দোলন আরম্ভ করলেন । উক্ত গণতান্ত্রিক ফ্রন্টে ছিলেন আতাউর রহমান, শেখ মুজিবর রহমান, শাহ আজিজুর রহমান, নুরুল আমিন, মোহাম্মদ সোলায়মান, মাহমুদ আলী, হামিদুল হক চৌধুরী প্রমুখ নেতাগণ । সোহরাওয়ার্দী এন,ডি,এফ, এর নেতৃত্ব দিলে ফ্রন্ট প্রচুর শক্তি ও জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হয় ।[১৪]

---

১৩। Dr.Zillur Rahman Khan and Dr.A.T.R. Rahman,"Provincial Autonomy and constitution Making the case of Bangladesh, Green Book House, Fp, 1973,P-35.

১৪। পাকিস্তান অবজারভার, ২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬২, শিরোনাম : জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের প্রতি সমর্থন ।

১৯৬২ সনের ২৫শে সেপ্টেম্বর আওয়ামী লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি জামাত-ই-ইসলাম, নেজামে ইসলাম এবং মুসলীম লীগের এক্টি অংশের সমন্বয়ে লাহোরে National Democratic Front গঠিত হয় ।

Dhaka University Institutional Repository

আওয়ামী লীগের পুনরুজ্জীবন ১৯৬৪ :

ইতিমধ্যে ৫ই ডিসেম্বর ১৯৬৩ সনে ভোররাত্রি ৩টায় বৈরুত ইন্টার কন্টিনেন্টাল হোটেলে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী হৃদ রোগে আক্রান্ত হয়ে ৭২ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর আওয়ামী লীগ সংগঠনের নিয়ন্ত্রন শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগারদের একটা অধিকতর তরুন গ্রুপের হাতে চলে যায় এবং তারাই আওয়ামী লীগকে পুনরুজ্জীবিত করেন। সুতরাং ১৯৬৪ সন থেকে শেখ মুজিব এর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ তার যাত্রা শুরু করে। অবশ্য গঠনতন্ত্র, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পূর্বের মতই থেকে যায়।

ছয়দফা :

১৯৬৬ সালে আওয়ামী লীগ কর্তৃক সূচিত ছয়দফা আন্দোলন বাংগালীর রাজনীতিকে উল্লেখযোগ্য ভাবে প্রগতিবাদী করে এবং পরবর্তী রাজনৈতিক আন্দোলন গুলির স্বপক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে। এই আন্দোলনে তার কর্মসূচী ও রনকৌশল উভয় দিক থেকেই অতীতের পূর্ব পাকিস্তানী রাজনৈতিক আন্দোলন সমূহ থেকে ছিল ভিন্ন। ছ'দফার দাবী দাবি ছিল এক স্মরনীয় সনদ বা দলিল, এটা কেন্দ্রীয় সরকারকে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য অধিক কিছু করতে বলেনি বরং পূর্ব পাকিস্তানকে তার নিজের জন্য অধিক করবার সুযোগ দেয়ার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রের কাছে দাবী তুলেছিল।

ছয় দফা ছিল নিম্নরূপ :

প্রথমত : পাকিস্তানের সংবিধান যুক্তরাষ্ট্রীয় এবং সরকার পার্লামেন্টারী পদ্ধতির। এই যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান ও পার্লামেন্টারী সরকার লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইবে। এতে কেন্দ্রীয় আইন সভার এবং যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত ইউনিটগুলির আইনসভার নির্বাচন হবে প্রত্যক্ষ এবং সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে। কেন্দ্রীয় আইন সভার প্রতিনিধি হবে জন-সংখ্যার ভিত্তিতে।

দ্বিতীয়ত : যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের অধীনে কেবলমাত্র দুইটি বিষয় থাকবে দেশরক্ষা এবং পররাষ্ট্র বিষয়। তা ছাড়া ৩ দফায় বর্ণিত শর্তাধীনে মুদ্রা।

তৃতীয়ত : দেশের দুইটি অংশের জন্য দুইটি পৃথক এবং সহজ বিনিময়যোগ্য মুদ্রা থাকবে অথবা ফেডারেল রিজার্ভ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রনে দুই অঞ্চলের জন্য একই মুদ্রা থাকবে।

Dhaka University Institutional Repository


এতে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের কর্তৃত্বাধীনে এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পরিচালনায় দুই অঞ্চলে দুইটি রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে। এই আঞ্চলিক রিজার্ভ ব্যাংক দুইটি আঞ্চলিক সরকারকে অর্থনৈতিক বিষয়ে পরামর্শ দান করিবে এবং এক অঞ্চল হতে যেন অন্য অঞ্চলে অবাধে অর্থ ও মূলধন পাচার হতে না পারে সেজন্য কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।

চতুর্থতঃ রাজস্ব সম্পর্কিত নীতি নির্ধারনের দায়িত্ব এবং কর ধার্যের ক্ষমতা অংগরাজ্য গুলির হাতে থাকবে। দেশ রক্ষা ও পররাষ্ট্র দফতর পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় রাজস্ব কেন্দ্রীয় সরকারকে দেওয়া হবে। সংবিধানে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে নির্ধারিত হারের ভিত্তিতে উক্ত রাজস্ব আদায়ের সংগে সংগে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিলে জমা হবে। কর নীতি উপর অংগরাজ্যগুলির নিয়ন্ত্রন ক্ষমতার লক্ষ্যের সহিত সংগতি রেখে কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্বের প্রয়োজন মিটাবার নিশ্চয়তা বিধানের ব্যবস্থা সংবিধানে থাকবে।

পঞ্চমত : যুক্তরাষ্ট্রের অনুর্গত অংগরাজ্যগুলির নিয়ন্ত্রনে প্রত্যেকটি ইউনিটের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার পৃথক হিসাব রাখবার শাসনতান্ত্রিক বিধান থাকবে শাসনতন্ত্রে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুযায়ী ধার্য হারের ভিত্তিতে অংগরাজ্যগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা মিটাবে। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পররাষ্ট্রনীতির কাঠামোর মধ্যে আঞ্চলিক সরকারগুলিকে বৈদেশিক বাণিজ্য এবং বৈদেশিক সাহায্য সম্পর্ক আলাপ-আলোচনা এবং চুক্তির ক্ষমতা সংবিধানে দেওয়া হবে।

ষষ্ঠত : অংগরাজ্যগুলিকে জাতীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কার্যকরী অংশ গ্রহণের সুযোগদান এবং আঞ্চলিক নিরাপত্তা ও সংহতি রক্ষা করবার সুযোগ প্রদান করা হবে। এই উদ্দেশ্যে প্রতিটি অংগরাজ্যকে স্বীয় কর্তৃত্বাধীনে আধা সামরিক বাহিনী বা আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠনের সুযোগ ও ক্ষমতা দিতে হবে।[১৫]

ঐতিহাসিক ছয়দফা আন্দোলনের গুরুত্ব অপরিসীম। এই আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালী জাতীয়তাবাদ পূর্ণতা লাভ করে। ইহা পূর্ব বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আশা আকাঙ্খার প্রতীক স্বরূপ। তাই এই আন্দোলনের পিছনে পূর্ব বাংলার বুদ্ধিজীবি, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, সরকারী কর্মকর্তা, ছাত্র জনতার সমর্থন ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। ছয় দফার দ্রুত ও ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ ক্ষমতাসীন সরকারকে চিন্তিত করে ফেলে। তাই আইয়ুব শাসন ছয়দফা আন্দোলনকে কঠোর

১৫। "আমাদের বাঁচার দাবী - ৬ দফা কর্মসূচী"। ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৬। শেখ মুজিবর রহমান প্রেসিডেন্ট পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ। প্রকাশক আবদুল মমিন, প্রচার সম্পাদক, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ। প্রকাশক আব্দুল মমিন, প্রচার সম্পাদক, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ, ৫১ পুরানা পল্টন, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository



হস্তে দমন করতে সচেষ্ট হন এবং ৮ই মে শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করা হয় । শেখ মুজিবের গ্রেফতার মুজিব জনপ্রিয়তাকে এমনভাবে বৃদ্ধি করে যে তিনি বাঙালী জাতীয়তাবাদের প্রতীক-এ পরিনত হন ।

১৯৬৭-৬৮ সনের গণ অভ্যুত্থানের মুখে আইয়ুব খান পদত্যাগ করতে বাধ্য হন । ক্ষমতাসীন রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খান নির্বাচনের তারিখ ঘোষনা করেন এবং ১৯৭০ সনে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিপুল ভোটে জয়লাভে সমর্থ হয় । ১৯৭০ সনের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পূর্ব বাংলার ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭ টি আসন লাভ করে এবং প্রাদেশিক পরিষদের ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৮২ টি আসন লাভ করে আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে ।[১৬] এই নির্বাচনের গুরুত্ব ছিল বিভিন্ন দিক থেকে । নির্বাচনে প্রমাণিত হয় যে, একমাত্র আওয়ামী লীগ বাঙালীদের প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠান এবং আওয়ামী লীগের সভাপতি বংগবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান একমাত্র ব্যক্তি যিনি বাঙালীদের পক্ষে কথা বলতে পারেন । তা ছাড়া এই নির্বাচনে বাংলাদেশের জনগণ সর্ব প্রথম সুযোগ পেয়েছিলো সুশাসন ও আত্মপ্রতিষ্ঠার দাবি আদায় করতে । তাই এই নির্বাচনকে বলা হয় বাঙালীদের গণভোট । কিন্তু ১৯৭০ সালের নির্বাচনে নির্বাচিত প্রার্থীদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করবার ফলে পাকিস্তানে এক বৈধতার সংকট দেখা দেয় । পরবর্তী এই নির্বাচন থেকে উদ্ভূত পরিস্থিতিই '৭০-'৭১ সনের ঘটনাবলী ভিতর দিয়ে পাকিস্তানের ধ্বংস ডেকে আনে এবং জন্ম দেয় নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশের ।

স্বাধীন বাংলাদেশের আওয়ামী লীগ :

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে এবং স্বাধীন বাংলাদেশের চেতনা বৃদ্ধিতে আওয়ামী লীগের ভূমিকা অত্যন্ত গৌরবোজ্জল । মুক্তি সংগ্রামে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে পূর্ব বাংলার জনগন স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনের জন্য জীবন মরন সংগ্রামে লিপ্ত হয় । বাংলাদেশের প্রবাসী সরকারকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সহায়তাকারী সকল রাষ্ট্র বৈধ সরকার বলে স্বীকার করে ।

---

১৬। Rounaq Jahan, 'Pakiston Failure in National Integration,' oxford university press, Ely House. London, Fp in Bangladesh, 1973, P-190.

Dhaka University Institutional Repository


১৯৭১ সনের ২৬শে মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষনা করা হয় । তবে ১৯৭১ সনের ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবসের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা পরিপূর্ণরূপে অর্জিত হয় ।

স্বাধীন বাংলাদেশে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে আওয়ামী লীগ । ক্ষমতাসীন সরকার হিসাবে দেশের জন্য একটি সংবিধান প্রনয়ন করতে প্রথম থেকেই সচেষ্ট উদ্যোগী হয়ে উঠে । ১৯৭২ সালের ১১ই জানুয়ারী রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে শেখ মুজিবর রহমান অস্থায়ী সংবিধান আদেশ জারী করেন । অতঃপর ১৯৭২ সালের ১০ই এপ্রিল গণপরিষদের স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার নির্বাচন করা হয় এবং ৩৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি সংবিধান কমিটি গঠন করা হয় । এই কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন আইন ও সংসদীয় মন্ত্রী ডঃ কামাল হোসেন । এই কমিটির প্রথম বৈঠক বসে ১৯৭২ সনের ১৭ই এপ্রিল । ১৮ই এপ্রিল সংবিধান কমিটি সংবিধানের মুখবন্ধ রচনা করে । ১১ই অক্টোবর সংবিধান কমিটির শেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । এই ভাবে কমিটি ৭৪টি অধিবেশনে মিলিত হয়ে প্রায় ৩০০ ঘন্টা আলোচনার পর সংবিধানের খসড়া রচনা করে ।

১৯৭২ সালের ১২ই অক্টোবর বাংলাদেশের জাতীয় জীবনে এক গৌরবোজ্জল দিন । গণপরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশনে ঐদিন বেলা ১১-৪৫ মিনিটে ৭৩ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট খসড়া সংবিধান অধিবেশনে পেশ করেন আইন ও সংসদীয় দপ্তরের মন্ত্রী । সংবিধান কমিটি রচিত খসড়ায় অনুন্য ৬৫টি সংশোধনী সংযুক্ত হয়ে ১৯৭২ সালের ৪ঠা নভেম্বর ইহা বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইনে রূপ লাভ করে ।[১৭]

প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমান সংবিধান প্রসংগে বলেন, "বাংলাদেশ গণপরিষদ যে সংবিধান রচনা করেছে তা বাংলাদেশের জনগণের তাজা রক্তে লেখা হয়েছে ।" সংবিধানের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো, এটা একটি লিখিত সংবিধান, প্রজাতন্ত্র ধরনের সংবিধান, এক কক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদ, নাগরিকদের মৌলিক অধিকার প্রদান, এককেন্দ্রিক সরকার, সংবিধানের প্রাধান্য ইত্যাদি ।

---

১৭। Zillur Rahman Khan, "Leadership Crisis in Bangladesh, "The university press Limited, FP, 1984, P-97.

- Abul Fazl Huq- constitution Making in Bangladesh, - Bangladesh politics, Ed. by Emajuddin Ahmed, social studies centre, 1980, P-5.

Dhaka University Institutional Repository



এই সংবিধান বিভিন্ন দিক থেকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ । সংবিধানটি বাঙালী জাতিকে দান করেছে এক গৌরবময় সংগ্রামের উর্বর ফসল এবং জাতীয় জীবনে সংযোজিত হয়েছে ঐতিহাসিক এক অধ্যায় । তা ছাড়া একদিকে যেমন জাতি এই সংবিধানের মাধ্যমে যুগোত্তীর্ণ হতে পেরেছে তেমনিই অপরদিকে এর মূল সুর ও সমগ্র বাঙালী জাতিকে দিয়েছে এগিয়ে যাবার এক অপূর্ব প্রেরণা ।

সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী এবং বাকশাল (১৯৭৫) :

১৯৭২ সন থেকে ১৯৭৫ সন পর্যন্ত শেখ মুজিব স্বাধীন বাংলাদেশে সর্বোচ্চ রাষ্ট্র ক্ষমতাধিকারী ছিলেন । প্রধান মন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতি হিসেবে কোনএকেই তাঁর কর্তৃত্ব ব্যাহত হয়নি । শেখ মুজিব তাঁর নিজের দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে তাঁর ক্যারিজমা দিয়ে ঢেকে রেখেছিলেন । দল তাঁর কারণেই মোটামুটি ভাবে ঐক্যবদ্ধ ছিল । দলের আর্থ, কর্মসূচী নিয়মনীতি, সাংগঠনিক শৃঙ্খলা সবকিছুতেই মুজিবের ব্যক্তিক প্রাধান্য অতি তীব্র ছিল । একারণে-১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ এর ভিতর ১৯৬৬ সাল থেকে শুরু করে পরবর্তী কালের ন্যায় কিংবা তার চেয়েও অনেক বেশী আস্থার সংগে দলীয় সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ন সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা শেখ মুজিবের হাতে ছেড়ে দেওয়া হত । বারংবার সাংগঠনিক প্রক্রিয়ায় সিদ্ধান্ত নেয়া অপেক্ষা নেতার উপর ব্যক্তিগত ভাবে আস্থা স্থাপন করাই দলের প্রধান রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল । আর এজন্যেই ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ এর মধ্যে আওয়ামী লীগ নানাবিধ উপদলীয় কোন্দল ভয়ানকভাবে মাথাচাড়া দিলেও একমাত্র দলের এক অংশ ও মূলতঃ অংগ সংগঠন ছাত্র লীগের একাংশ ভেংগে জাসদ গঠিত হওয়া ব্যাতিরেকে মূল দল একত্রিত ছিল ।

এই সময় দেশের সার্বিক পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে, '৭৪ সালের এপ্রিলের দিক থেকেই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ শুরু হয় । সেপ্টেম্বরের দিকে তা ব্যাপক রূপ নেয় এবং রাজধানী ঢাকাসহ বিশেষ করে উত্তরাঞ্চলে সংখ্যাহীন মানুষ অনাহারে মৃত্যুবরণ করে । দুর্ভিক্ষ মোকাবিলাসহ পরিস্থিতির উন্নয়নের পরিবর্তে শেখ মুজিব তখন রাজনৈতিক আন্দোলন এবং সরকার বিরোধিতার পথরোধ করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন । ১৯৭৪ সালের ২৮শে ডিসেম্বর তিনি সারাদেশে জরুরী অবস্থা ঘোষনা করেন । ৩রা জানুয়ারী ১৯৭৫ সনে 'জরুরী ক্ষমতাবিধি' জারী করা হয় । ২১শে জানুয়ারী অওয়ামীলীগ পার্লামেন্টারী পার্টির বৈঠকে তিনি মূল ক্ষমতা নিজের হাতে তুলে নেন । ২৫ জানুয়ারী '৭৫ সনে জাতীয় সংসদের মাত্র

Dhaka University Institutional Repository


কয়েক মিনিট স্থায়ী অধিবেশনে ১৯৭২ সালের শাসন তন্ত্রের মৌলিক পরিবর্তন করা হয়। ৪র্থ সংশোধনীর মাধ্যমে পার্লামেন্টারী সরকার পদ্ধতির স্থলে প্রেসিডেন্ট শাসিত পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়। মুজিব স্বয়ং প্রেসিডেন্ট হন এবং সকল দল বাতিল করে একটি মাত্র রাজনৈতিক দল রাখবার বিধান সন্নিবেশিত হয়। এর প্রতিবাদে জেনারেল (অবঃ) এম,এ, জি, ওসমানী এবং ইত্তেফাক সম্পাদক মইনুল হোসেন আওয়ামী লীগ ও জাতীয় সংসদ থেকে পদত্যাগ করেন।

কিছু দিন পর '৭৫ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারী রাষ্ট্রপতি হিসাবে এক আদেশ বলে শেখ মুজিব দেশের একমাত্র দল গঠনের কথা ঘোষনা করেন : বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ। এটিই বাকশাল নামে পরিচিত। তিনি নিজে এর চেয়ারম্যান হন এবং সেই সংগে আওয়ামী লীগসহ সকল দলের বিলুপ্তি ঘটে। ২৫শে এপ্রিলের মধ্যে শেখ মুজিব সকলকে বাকশালে যোগ দেবার নির্দেশ দেন। ৬ই জুন ঘোষিত এক নির্দেশে তিনি ১১৫ সদস্য বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করেন। দলের সর্বোচ্চ কমিটিকে বলা হয়েছিল 'কার্য নির্বাহী কমিটি' এবং এর সদস্য সংখ্যা ছিল ১৫ জন। বাকশালের ঘোষিত গঠনতন্ত্রে চেয়ারম্যানকে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী করা হয়েছিল।[১৮]

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পুনরুজ্জীবন :

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট সংঘটিত অভ্যুত্থানে শেখ মুজিবর রহমানের মৃত্যুর পর তার উত্তর সূরীরা বাকশালের মধ্যে বিলুপ্ত আওয়ামী লীগকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন। ১৯৭৬ সনের ২৮শে জুলাই "রাজনৈতিক দলবিধি" (পি,পি,আর,) জারী করে ঘরোয়াভাবে রাজনৈতিক কার্যক্রম চালানোর অনুমতি দেয়া হয় এবং প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলকে সরকারী ছাড়পত্র লাভের জন্য আবেদন করতে বলা হয়। এই সময় অনেকগুলি রাজনৈতিক সংগঠন রাতারাতি সংগঠিত হয় এবং নতুন রাজনৈতিক দল হিসেবে আত্ম প্রকাশ করে। ১৯৭৬ এ রাজনৈতিক দলবিধি জারীর অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই ৫৮টি দল অনুমোদনের জন্যে আবেদন করে। এর মধ্যে যে

---

১৮। মওদুদ আহমদ - বাংলাদেশ : শেখ মুজিবর রহমানে শাসনকাল, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, বাংলা প্রথম সংস্করণ, নভেম্বর ১৯৮৭, পৃষ্ঠা ৩১৪

___ Rounaq Jahan-Bangladesh politics: Problems and Issues, Bangladesh Books International,1980,P-82-83.

Dhaka University Institutional Repository


কয়েকটি দল অনুমোদন পায় তারমধ্যে এই দলটি অন্যতম।[১১] বাকশাল থেকে পুনরায় যখন দলটি পুনরুজ্জীবিত হয় তখন আওয়ামী লীগ নামে আবার দলটির প্রত্যাবর্তন ঘটে। শুধু তাই নয়, পুর্ন গঠিত আওয়ামী লীগের ঘোষনায় ১৯৭২ সালের সংবিধানের পুর্নবহাল দাবি করা হয় এবং এর গঠনতন্ত্র, কর্মসূচী, লক্ষ্য, প্রস্তাবনা ও দলীয় সাংগঠনিক কাঠামো ঘোষনা করা হয়।

প্রস্তাবনা :

বাংলাদেশের বিপ্লবী গণমানুষের বিজয়ের প্রতীকস্বরুপ স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ বিশ্বের সকল স্বাধীনতাকামী মানুষের প্রেরণা যোগাতে থাকবে।

একটি মহান লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যেই দেশের সংগ্রামী মানুষ কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, যুবক তদানীন্তন পুলিশ, ই,পি,আর, এবং সশস্ত্র বাহিনী সেই দিন নিষ্ঠুর শোষন এবং বর্বর হামলার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারন করেছিল। সেই মহান লক্ষ্য হলো জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গনতন্ত্র ধর্মনিরপেক্ষতা বংগবন্ধু ঘোষিত বাংলাদেশ সংবিধানে গৃহীত রাষ্ট্রীয় এই চার মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত এক শোষনমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।

সেই স্বাধীনতা যুদ্ধের নেতৃত্বের ঐতিহাসিক দায়িত্ব এসেছিল বংগবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের উপর তথা আওয়ামী লীগের উপর। সে দায়িত্ব বিচক্ষনতা ও বলিষ্ঠতার সাথে পালন করবার ফলেই অতি অল্প সময়ে পৃথিবীর মানচিত্রে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে।

সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশের শাসনভার অর্পিত হয় আওয়ামী লীগের উপর। বংগবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার এক বৎসরের মধ্যেই একটা গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রনয়ন করে।

দেশের স্বাধীনতাকে সংহত করে অর্থ নীতিতে ঔপনিবেশিক ও পুঁজিবাদী শোষনের সকল চিহ্ন মুছে ফেলে শোষিত, বঞ্চিত জনসাধারনের আশা আকাংখা বাস্তবে রুপদান করাই ছিল সাড়ে তিন বছর আওয়ামী লীগ শাসনের মূল লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য সামনে রেখে বংগবন্ধু শাসন ব্যবস্থায় যেমন গণতান্ত্রিক কাঠামো গড়ে তোলেন তেমনি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রগতিশীল কর্মসূচী গ্রহণ করেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশ হয়েছিল বিধ্বস্ত, লুন্ঠিত। স্বাধীনতার লগ্নে সেই সীমাহীন দুঃখ

---

১১। বিচিত্রা, ৫ম বর্ষ, ২১ সংখ্যা, ঢাকা, ২২ অক্টোবর, ১৯৭৬।

Dhaka University Institutional Repository


দুর্দশা এবং ধ্বংস স্তূপের মাঝে দাঁড়িয়ে দেশ ও জাতির প্রতি আওয়ামী লীগকে দায়িত্ব পালনে অগ্রসর হতে হয়েছে।

কিন্তু অপর দিকে মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত শক্তি বাংলাদেশের প্রগতিশীল রূপান্তরের প্রক্রিয়াকে ভাল চোখেদেখে নাই। বংগবন্ধুর শাসনামলেই তারা সরকারের প্রগতিশীল কর্মসূচী সমূহ বানচাল করবার অপচেষ্টায় মেতে উঠে। বংগবন্ধুর শত হুঁশিয়ারী ও সতর্কবাণী সত্ত্বেও তারা তাদের ষড়যন্ত্র মূলক তৎপরতা থেকে বিরতি হয় নাই। বংগবন্ধু অবশেষে দেশী ও বিদেশী ষড়যন্ত্র কারীদের সকল চক্রান্ত নস্যাৎ করে দেশের বৈপ্লবিক রূপান্তরের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করবার লক্ষ্যে তাঁর দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচী ঘোষনা করেন।

বংগবন্ধুর এই পদক্ষেপের ফলে ষড়যন্ত্রকারীরা বুঝতে পারে যে, বংগবন্ধুর কর্মসূচী বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের উপর তাদের প্রভাব আর কোনদিন বিস্তার করা সম্ভব হবে না। সাম্রাজ্যবাদের নীলনক্সা অনুসারে তাই তারা ১৯৭৫ সনের ১৫ই আগষ্ট বংগবন্ধুর প্রায় অরক্ষিত বাসভবনে সশস্ত্র হামলা চালায়। দুবৃত্তরা বংগবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করে। একই সংগে হত্যাকরে কৃষক নেতা আবদুর রব সেরনিয়াবাত ও মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক শেখ ফজলুল হক মনিকে।

শুধু তাই নয় ৩রা নভেম্বর কারাগারের অভ্যন্তরে চার জাতীয় নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজুদ্দীন আহমেদ, এম মনসুর আলী এবং কামরুজ্জামানকেও নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়।

সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল ইচ্ছুক সহযোগীদের নিয়ে দল গঠন এবং তথা কথিত নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ক্ষমতা বৈধকরণ এই চক্রে পড়ে বাংলাদেশের মানুষ ৭৫ এর ১৫ই আগষ্টের পর থেকে এক দুর্বিসহ জীবন যাপন করছে।

হত্যা ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতির পথ ধরে বেশ কয়েকবার সরকারের পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু উল্লেখিত কার্যক্রমের এক সরকারের সাথে আরেক সরকারের মৌলিক কোন পার্থক্য দেখা যায়না।

আওয়ামী লীগ বারবার ষড়যন্ত্রকারীদের প্রতি বিপ্লবী তৎপরতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। আওয়ামী লীগ সামাজিক বিপ্লবের পথ ধরে অগ্রসর হচ্ছে। বঞ্চিত, শোষিত এবং লাঞ্ছিত মানুষের মধ্যেই আওয়ামী লীগের জন্ম এবং তাদের দুঃখ দুর্দশা মোচনের সংগ্রামের মধ্যে দিয়েই আওয়ামী লীগের অগ্রগতি। যে লক্ষ্য সামনে রেখে মুক্তিযুদ্ধে ত্রিশ লক্ষ মানুষ

Dhaka University Institutional Repository


জীবন দিয়েছে, -যে আদর্শ বাস্তবায়িত করতে গিয়ে বংগবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে জীবন দান করতে হয়েছে, সেই লক্ষ্য ও আদর্শ প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত আওয়ামী লীগ তার সংগ্রাম অব্যাহত রাখবে । জাতীয়তাবাদ সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা এই চারটি নীতির উপর এক শোষনমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অবশ্যই আওয়ামী লীগ সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন বাস্তবায়িত করছে ।

স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের বিরুদ্ধে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চক্রানুকারীদের কার্যকলাপ সম্পর্কে আওয়ামী লীগ সচেতন তাই দেশবাসীর আশা ভরসার প্রতীক আওয়ামী লীগের সংগ্রামী সহ কর্মীদের কর্মশক্তি ও দেশাত্মবোধের উপর আস্থা রেখে আওয়ামী লীগ ও তাদের দলীয় ঘোষনা পত্র ও কর্মসূচী উপস্থাপিত করেছে ।

নাম :

১। এই প্রতিষ্ঠানের নাম হবে, " বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ " ।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :

২। (ক) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা দ্বারা বাংগালী জাতির ঐক্য ও সংহতি বিধান করবে নরনারী ও ধর্ম , বর্ণ সম্প্রদায় নির্বিশেষে মৌলিক মানবাধিকারও স্বাধীনতা বিধান করবে মানব সত্তার মর্যাদা ও মূল্যের স্বীকৃতি মানুষের স্বাভাবিক জীবন বিকাশের পরিপূর্ন সুযোগ সৃষ্টি , ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিতকরন, সকল সাম্প্রদায়িকতার বিলোপ সাধন করবে । তা ছাড়া কৃষক শ্রমিকসহ সকল মেহনতি ও অনগ্রসর জনগণের উপর শোষন অবসানের জন্য পূর্ন অর্থনৈতিক মুক্তি ও সামাজিক স্বাধীনতা এবং ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শোষনমুক্ত ও সুষম সাম্যভিত্তিক এক সমাজ প্রতিষ্ঠা করবে সর্বাংগীন গ্রামীন উন্নয়ন ও কৃষি ব্যবস্থার আমুল সংস্কার ও যান্ত্রিকীকরন এবং সমবায় ভিত্তিতে চাষাবাদ পদ্ধতির প্রচলন, কৃষি ও শিল্পের প্রসার এবং উৎপাদন বৃদ্ধি, উৎপাদন ও বন্টন নিয়ন্ত্রনে কৃষক শ্রমিকের অংশ গ্রহণের সুযোগ প্রদান করা হবে । মানুষের সাধারণ জীবন যাত্রার মনোন্নয়ন, বেকারত্ব দূরীকরন ও অধিকতর কর্মসংস্থান, সমাজের প্রয়োজনের সংগে সামঞ্জস্যপূর্ন গণমুখী সার্বজনীন সুলভ গঠনাত্মক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন,অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, স্বাস্থ্য, রক্ষাসহ মানুষের দৈনন্দিন জীবন ধারনে মৌলিক সমস্যাবলীর সু সমাধান করা । তা ছাড়া সুয়ংসম্পূর্ন

Dhaka University Institutional Repository


ও সুষম অর্থনীতির সুদৃঢ় ভিত্তি রচনা, ব্যক্তিগত সম্পত্তির সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারন, বিচার ব্যবস্থার কালোপযোগী জনকল্যাণ কর পরিবর্তন সাধন এবং গণজীবনের সর্বস্তর হতে দুর্নীতীর মুলোচ্ছেদ করা । এই সকল নীতি সমূহ ও উদ্দেশ্যাবলী দেশের সমগ্র জনগনের ঐক্যবদ্ধ ও সুসংহত উদ্যম সৃষ্টির মাধ্যমে শান্তিপূর্ন ও গণতান্ত্রিক পন্থায় বাস্তবে রূপায়িত করতে অবিচল নিষ্ঠা, সততা, শৃঙ্খলা ও দৃঢ়তার সহিত সর্বোতভাবে আত্মনিয়োগ করবে ।

(খ) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার সকল প্রচেষ্টার সাহায্য ও সহযোগিতা করবে এবং সাম্রাজ্যবাদ উপনিবেশবাদ ও বর্ণ বৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের সর্বত্র নিপীড়িত জনগনের ন্যায় সংগতি মুক্তির সংগ্রামকে সমর্থন করবে ।

গঠন প্রণালী :

নিম্নলিখিত সাংগঠনিক ইউনিট সমবায়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ গঠিত :-

(ক) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কাউন্সিল ।

(খ) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ জাতীয় কমিটি ।

(গ) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী সংসদ ।

যেমন :- (১) সভাপতি, (২) সভাপতি মন্ডলী, (৩) সাধারণ সম্পাদক, (৪) সম্পাদক মন্ডলী, (৫) কোষাধ্যক্ষ, (৬) ২৭ জন সদস্য ।

(ঘ) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সংসদীয় বোর্ড ।

(ঙ) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কর্তৃক অনুমোদিত জেলা আওয়ামী লীগ সমূহ- ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী মহানগর আওয়ামী লীগ এবং উহাদের অনুরূপ অন্যান্য আওয়ামী লীগ সমূহ ।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কর্মকর্তাগণ :

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নিম্নলিখিত কর্মকর্তাগণ থাকবেন :-

১। সভাপতি

২। সভাপতি মন্ডলী :

(ক) সভাপতি,

(খ) ১২ জন সভাপতি মন্ডলী সদস্য

(গ) সাধারণ সম্পাদক (পদাধিকার বলে)

Dhaka University Institutional Repository



৩। সম্পাদক মন্ডলী :

(ক) সাধারণ সম্পাদক

(খ) ২ জন যুগ্ম সম্পাদক

(গ) সম্পাদক, সংগঠন বিভাগ

(ঘ) " প্রচার ও প্রকাশন বিভাগ

(ঙ) " দপ্তর বিভাগ

(চ) " শ্রম বিভাগ

(ছ) " কৃষি ও সমবায় বিভাগ

(জ) " শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিভাগ

(ঝ) " তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক

(ঞ) " ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ বিষয়ক

(ট) " আন্তর্জাতিক বিষয়ক

(ঠ) " আইন বিষয়ক

(ড) " অর্থ ও পরিকল্পনা বিষয়ক

(ঢ) সম্পাদিকা মহিলা বিভাগ

(ন) সহ-সম্পাদক, প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ

(ত) " দপ্তর বিভাগ

(থ) " তথ্য ও গবেষণা বিভাগ

কোষাধ্যক্ষ :

সভাপতি, সভাপতি মন্ডলীর সদস্যবৃন্দ, সাধারণ সম্পাদক, সম্পাদক মন্ডলীর অন্যান্য সদস্য (মহিলা সম্পাদিকা ব্যতীত) নিজ নিজ পদে দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল কর্তৃক কাউন্সিলারদের মধ্য থেকে সরাসরি নির্বাচিত হবেন। গঠন তন্ত্রের ২৩ (ঘ) ধারা মতে বাংলাদেশ মহিলা আওয়ামী লীগ প্রধান পদাধিকার বলে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মহিলা সম্পাদিকা হবেন। উপরিউক্ত কর্মকর্তা ও কার্যনির্বাহী সংসদের সদস্যগনের কার্যকাল দুই বৎসর হবে। পরবর্তী নির্বাচন পর্যন্ত তারা স্ব স্ব পদে বহাল থাকবেন।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বিভিন্ন শাখার পারস্পরিক সম্পর্ক ও মর্যাদা :

১। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের অধীনে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী মহানগরে

Dhaka University Institutional Repository

জেলার মর্যাদা সম্পন্ন ১ টি করে মহানগর ও প্রত্যেক জেলায় ১ টি করে জেলা আওয়ামী গঠিত হবে ।

২। প্রত্যেক জেলা আওয়ামী লীগের অধীনে প্রতি থানায় একটি করে থানা আওয়ামী লীগ এবং জেলা সদরে থানার মর্যাদা সম্পন্ন পৌর আওয়ামী লীগ গঠিত হবে ।

৩। প্রতিটি মহানগর আওয়ামী লীগের অনুর্গত প্রতি ওয়ার্ডে একটি করে ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ গঠিত হবে এবং সেই গুলি থানা আওয়ামী লীগের মর্যাদা সম্পন্ন হবে ।

৪। মহানগরে ওয়ার্ড সমূহের প্রতি ইউনিটে একটি করে ইউনিট আওয়ামী লীগ গঠিত হবে এবং ইহা মহানগর আওয়ামী লীগের প্রাথমিক ইউনিট রূপে গণ্য হবে ।

৫। প্রত্যেক থানা আওয়ামী লীগের অধীনে প্রতি ইউনিয়নে ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ, পৌর এলাকায় প্রতি ওয়ার্ডে আওয়ামী লীগ গঠিত হবে ।

৬। ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের অধীনে প্রতিটি ওয়ার্ডে ১টি করে ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ কমিটি গঠিত হবে । এই ওয়ার্ড কমিটি সমূহ প্রাথমিক শাখা হিসাবে গণ্য হবে ।

৭। ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ গঠন করবার পূর্বে গ্রাম থেকে প্রাথমিক সদস্য সংগ্রহ করতে হবে । প্রত্যেক ওয়ার্ডে কমপক্ষে ১০০ জন প্রাথমিক সদস্য থাকতে হবে ।

সদস্য পদ :

গঠনতন্ত্রের ২ ধারায় বর্ণিত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নীতি ও উদ্দেশ্য বিশ্বাস করে নির্ধারিত 'ফরম ক' প্রদত্ত ঘোষনা পত্রে দস্তখত করে দ্বি-বার্ষিক দুই টাকা চাঁদা প্রদান করে ১৮ বৎসর বা তদূর্ধ বয়স্ক বাংলাদেশ এর নারী পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিক যাহারা :

(ক) বাংলাদেশ স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা, অখন্ডতা, জাতীয় সংহতি, রাষ্ট্রীয় আদর্শ ও জননিরাপত্তা বিরোধী এবং হিংসাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত রয়েছেন বলে প্রতীয়মান নহেন ।

(খ) কোন বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন নাই কিংবা কোন বিদেশী রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য ঘোষনা বা স্বীকার করেন নাই ।

(গ) অন্যকোন রাজনৈতিক দলের সদস্য নহেন ।

(ঘ) কোন প্রকার ধর্ম, পেশা এবং জন্মগত শ্রেণী বৈষম্যে বিশ্বাস করেন না ।

(ঙ) আওয়ামী লীগের নীতি ও আদর্শের পরিপন্থী কোন সংগঠনের সদস্য নহেন ।

Dhaka University Institutional Repository


(চ) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কার্য নির্বাহী সংসদ কর্তৃক নির্দেশিত ন্যূনতম প্রশিক্ষন ব্যবস্থা গ্রহণে ও যে কোন নির্দেশ পালনে বাধ্য থাকবেন ।

(ছ) দ্বি-বার্ষিক চাঁদা নিয়মিত পরিশোধ করেন তাঁরা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সদস্য হতে পারবেন ।

২। সংগঠনে দুই প্রকার সদস্যপদ থাকবে :

(ক) প্রাথমিক ও (খ) পূর্নাংগ সদস্য । প্রাথমিক সদস্যের এক বৎসর মেয়াদ পূর্ন হলে সংশ্লিষ্ট কমিটি প্রাথমিক সদস্যকে পূনাংগ সদস্য পদ প্রদানের জন্য দলীয় জেলা কার্যনির্বাহী সংসদের নিকট সুপারিশ করতে পারবে । জেলা কার্যনির্বাহী সংসদ দলের পূনাংগ সদস্যপদ প্রদান করতে পারবেন ।

পূর্ন সদস্য না হলে কেউ সংগঠনের কোনস্তর বা টায়ারে কোন কর্মকর্তা নির্বাচিত হতে পারবেন না ।

সদস্য পদের মেয়াদ :

বাংলা বৎসরের পহেলা বৈশাখ থেকে পরবর্তী বৎসরের চৈত্র মাসের শেষ দিন পর্যন্ত সদস্য পদ বলবৎ থাকবে । উল্লেখিত মেয়াদ অন্তে নির্ধারিত হারে চাঁদা প্রদান করে নির্ধারিত ফরমে দস্তখত করে সদস্য পদ পুনরুজ্জীবিত করা যাবে ।

প্রতিষ্ঠানিক শৃঙ্খলা :

১। কোন সদস্য আওয়ামী লীগের আদর্শ, উদ্দেশ্য, কর্মসূচী, গঠনতন্ত্র, নিয়মাবলী বা প্রতিষ্ঠানের স্বার্থের পরিপন্থী কার্যকলাপে অংশ গ্রহণ করলে এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কাউন্সিল, কার্য নির্বাহী সংসদ , সংসদীয় বোর্ড, বা সংসদীয় পার্টির বিরুদ্ধে কোন কাজ করলে, শৃঙ্খলা ভংগের অভিযোগে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী সংসদ তাঁর বিরুদ্ধে যে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে ।

২। প্রতিষ্ঠানের কোন সদস্যের বি রুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবার ক্ষমতা একমাত্র বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কার্য নির্বাহী সংসদের থাকবে ।

৩। প্রত্যেক শাখা আওয়ামী লীগকে তার উর্ধতন শাখার নিকট থেকে মনুষ্য গ্রহণ করতে হবে । তা ছাড়া আবশ্যকবোধে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী সংসদ যে কোন শাখাকে সরাসরি মনুষ্য প্রদান করতে পারবে ।

Dhaka University Institutional Repository

৪। কোন শাখা আওয়ামী লীগের মধ্যে সংগঠন সংক্রান্ত কোন গোলযোগ বা বিরোধ দেখা দিলে উর্ধতন শাখা উহা নিষ্পত্তিকরতে পারবে । কিন্তু এই সম্পর্কিত বিরুদ্ধে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী সংসদের নিকট আপীল করা যাবে এবং সেই ক্ষেত্রে উহার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে ।

৫। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী সংসদের শাস্তিমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ জাতীয় কমিটির নিকট সংগঠনের সাধারণ সম্পাদকের মাধ্যমে আপীল করা চলবে এবং এরূপ ক্ষেত্রে জাতীয় কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে ।

৬। আপীলের আবেদন পত্র সাধারণ সম্পাদক প্রাপ্তির রশিদ দিয়ে গ্রহণ করবেন এবং জাতীয় কমিটির নিকট পেশ করতে বাধ্য থাকবেন । অন্যথায় জাতীয় কমিটির যে কোন সদস্য সভাপতির অনুমতি নিয়ে বিষয়টি বিবেচনা ও সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য উত্থাপন করতে পারবেন ।

৭। জাতীয় কমিটি সভা আহবানের নোটিশ দেওয়ার ৭ দিনের মধ্যে উক্ত আপীলের দরখাস্ত সাধারণ সম্পাদকের নিকট পেশ করতে হবে । সাধারণ সম্পাদক এইরূপ ক্ষেত্রে উক্ত বিষয়গুলি জাতীয় কমিটির কার্যসূচী ভুক্ত করতে বাধ্য থাকবে ।

৮। শৃঙ্খলা ভংগের দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কারণ দর্শাইবার জন্য সুযোগদানের উদ্দেশ্যে সাধারণ সম্পাদক পোস্টাল রেজিস্ট্রেশন যোগে নোটিশ দিতে বাধ্য থাকবেন ।

৯। শৃঙ্খলা ভংগের অভিযোগ প্রমাণীত হলে অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে যে কোন রূপ শাস্তি প্রদানের ক্ষমতা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কার্য নির্বাহী সংসদের থাকবে ।

মূলনীতি :

জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, এবং ধর্ম নিরপেক্ষতা হবে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মূলনীতি । দলটি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী । আওয়ামী লীগ দলের পরিকল্পিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগনই রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হবে । এই ব্যবস্থাধীনে প্রতিটি নাগরিক আইনের সম্মুখে সমান মর্যাদা এবং প্রকৃত স্বাধীনতার অধিকার লাভ করবে ।

সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা এবং জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণে রাষ্ট্রের দায়িত্ব :

সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করবার দায়িত্ব রাষ্ট্রকে গ্রহণ করতে হবে । প্রতিটি নাগরিকের জীবন ধারন করবার মৌলিক চাহিদা সমূহ বিশেষতঃ খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা

Dhaka University Institutional Repository



চিকিৎসা এবং যুক্তিসংগত বেতন মজুরীতে জীবিকা অর্জনের সুযোগ দানের দায়িত্ব রাষ্ট্রকে গ্রহণকরতে হবে।

আইনের দৃষ্টিতে সমান মর্যাদা :

এই অধিকার সুনিশ্চিত করবার জন্য এমন কার্যকরী ব্যবস্থা রাষ্ট্রকে গ্রহণ করতে হবে যেন প্রতিটি নাগরিক আইনের সাহায্য সহায়তা লাভের অবাধ সুযোগ লাভ করেন।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা :

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থা থেকে বিচার বিভাগকে পৃথকী করনের নিশ্চয়তা প্রদান করতে হবে।

মৌলিক অধিকার :

বাক্ ও ব্যক্তি স্বাধীনতা চলাফেরা করা ও সভা সমিতি করবার স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা সহ সকল মৌলিক স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

অর্থনৈতিক কর্মসূচী :

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের আদর্শ এক শোষনমুক্ত ও উন্নত সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করা। সমাজের বৈপ্লবিক পরিবর্তন অর্জনের জন্য সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দলের বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

শিক্ষা ব্যবস্থা :

শিক্ষার মূল লক্ষ্য এমন হওয়া উচিত যেন বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিক তার নিজস্ব বুদ্ধিমত্তা ও গুণাবলীর বিকাশ সাধনে সক্ষম হন।

স্বাস্থ্য ও জনসংখ্য নিয়ন্ত্রন :

একটি রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হচ্ছে দেশের নাগরিকদের সুস্থ জীবন যাপনের জন্য চিকিৎসা লাভের পরিপূর্ন নিশ্চয়তা বিধান।

Dhaka University Institutional Repository



বন্দর সমূহঃ

সামুদ্রিক বন্দর এবং আভ্যন্তরীন নদী বন্দর সমূহের উন্নয়নকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। চট্টগ্রাম ও চালনা বন্দরের বর্তমান সুযোগসুবিধা এবং কার্য ক্ষমতার বিপুল উন্নয়ন সাধন করতে হবে।

গৃহনির্মান :

প্রাত্যহিক জীবনে বাসস্থান সমস্যা একটি গুরুত্বপূর্ন সমস্যা। নিম্নবেতনভুক্ত কর্মচারী ও গ্রামীন বাসিন্দাদের বাসস্থান সমস্যা সমাধান কল্পে সরকারকে কয়েকটি যুক্তিসংগত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

সুষম সামাজিক উন্নয় ও নারীর মর্যাদা :

আমাদের লোক সংখ্যার অর্ধেকই নারী। শিক্ষার অভাবে তারা সমাজে তাদের প্রকৃত মর্যাদা থেকে বঞ্চিত রয়েছে। তাই যত দ্রুত সম্ভব নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের সাধন করতে হবে।

যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা :

দেশের যান বাহন, সড়ক যোগাযোগ রেলওয়ে যোগাযোগ ও সেতু নির্মানের মত অতীব গুরুত্বপূর্ন বিষয়ের উন্নয়নের জন্য সুষ্ঠ পরিকল্পনা গ্রহণ করবে।

যুব শক্তি এবং মুক্তিযোদ্ধা :

দেশ গঠন এবং জাতি গঠনের কার্যে প্রকৃতভাবে যুবশক্তিকে ব্যবহার করতে হবে। তাদেরকে জাতি গঠনের কর্মসূচীর সংগে নিয়োজিত করতে হবে।

স্বাধীনতা যুদ্ধের শিকার :

স্বাধীনতা যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের পুর্নবাসনের জন্য একটি ধারাবাহিক কর্মসূচী গ্রহণ করা অপরিহার্য।

পশ্চাদপদ অঞ্চল সমূহ ও অনুন্নত সম্প্রদায় সমূহ :

আমাদের দেশের অবহেলিত পাহাড়ী অঞ্চল সমূহকে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের সমপর্যায়ে উন্নতি করবার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি :

গণ মানুষের আত্মচেতনায় উদ্বুদ্ধ সাংস্কৃতিক বিকাশের মাধ্যমে জাতিসত্তার বাংলালী

Dhaka University Institutional Repository


জাতীয়তাবোধ যেন রূপ পায় সে লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ নিয়মতান্ত্রিক পথে কাজ করে যাবে।

প্রতিরক্ষা :

দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করবার জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বৈদেশিক নীতি :

বাংলাদেশের ভৌগলিক, রাজনৈতিক, সার্বভৌমত্ব এবং কষ্টার্জিত স্বাধীনতাকে রক্ষা করবার আদর্শেই অনুপ্রানিত হবে আমাদের বৈদেশিক নীতি।

শান্তিপূর্ন সহ অবস্থান :

"সকলের প্রতি বন্ধুত্বসুলভ মনোভাব এবং কারও প্রতিবৈরী মনোভাব নয়" এই মূলনীতি অনুযায়ী আওয়ামী লীগ সকল রাষ্ট্রের সংগে শান্তিপূর্ন ভাবে বসবাস করবে।

নিরস্ত্রী করণ :

ক্ষুধা ও দারিদ্র জর্জরিত সমগ্র বিশ্বে অস্ত্রের প্রতিযোগিতা সমর্থন করা যায় না। আওয়ামী লীগ অস্ত্রের প্রতিযোগিতা বন্ধ করবার জন্য সর্বোতভাবে চেষ্টা করবে।[২০]

১৯৪৯ সনে প্রতিষ্ঠালগ্নে আওয়ামী মুসলীম লীগ এবং ১৯৫৫ সনে আওয়ামী লীগে রূপান্তরিত হবার পরেও স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭২ সনে আওয়ামী লীগ যে সমস্ত কর্মসূচী গ্রহণ করেছে আমি বিস্তারিত ভাবে এই অধ্যায়ে তা আলোচনা করেছি। একই সংগে দলটির উৎপত্তি, লক্ষ্য এবং প্রকৃতি সম্পর্কেও আলোকপাত করা হয়েছে।

---

২০। গঠনতন্ত্র ও ঘোষনাপত্র : বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ। প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিম কর্তৃক ২৩, বংগবন্ধু এভিনিউ, ঢাকা, ১৯৮৭ সন থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

## আওয়ামী লীগ দলের ভাংগন

### আওয়ামী লীগের প্রথম ভাংগন ১৯৫৭ :

১৯৫৬ সনের ৬ই সেপ্টেম্বর পূব বাংলায় আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে মন্ত্রী সভা গঠিত হয় । অপরদিকে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে ১২ই সেপ্টেম্বর কেন্দ্রে গঠিত হয় আওয়ামী লীগ ও রিপাবলিকান পার্টির যৌথ মন্ত্রীসভা ।

আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় যাওয়ার পর থেকেই সংগঠনের নেতা ও ক্ষমতাসীনদের মধ্যে সংঘাত শুরু হয়েছিলো । প্রধান মন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী নিজের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ প্রত্যাঘাত শাসনতন্ত্রের পক্ষ সমর্থন করতে থাকেন । স্বায়ত্বশাসনের দাবীকে তিনি অযৌক্তিক আখ্যা দেন । এবং পররাষ্ট্রনীতির প্রশ্নেও চলে যান সংগঠন বিরোধী অবস্থানে । ১৯৫৬ সালে অক্টোবরের শেষ ভাগে বৃটেন, ফ্রান্স ও ইসরাইল মিলিতভাবে মিসরের উপর আক্রমন চালালে সংঘাত তীব্রতর হয় । মাওলানা ভাসানীর আহবানে ৯ই নভেম্বর সারা পূব বাংলায় " সুয়েজ দিবস" ও হরতাল পালিত হয় এবং পশ্চিম পাকিস্তানেও আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে । সরকারের সাম্রাজ্যবাদমুখী পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করায় সোহরাওয়ার্দী অচিরেই পাল্টা ব্যবস্থা শুরু করেন । কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুল হক ওসমানীকে তিনি অপসারিত করলে পশ্চিম পাকিস্তানে ঐ সংগঠন দ্বিখন্ডিত হয়ে পড়ে ।[১]

আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে কেন্দ্র করে ভাসানীর সংগে সোহরাওয়ার্দীর মত পার্থক্য দিতে থাকে । ভাসানী যে কোন প্রকার যুদ্ধ জোটের বিরোধিতা করেন এবং যুদ্ধ জোট মানব সভ্যতার বিকাশের অন্তরায় বলে উল্লেখ করেন । কাগমারী সম্মেলনে এই বিষয়টিও জোর পায় ।[২]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে ছাত্র শিক্ষকদের এক সমাবেশে ৯ই ডিসেম্বর ভাষনদানকালে সোহরাওয়ার্দী তাঁর বিখ্যাত শূন্য তত্ত্ব " জিরো থিওরী " উপস্থিত করে বলেছিলেন " মুসলিম বিশ্বের সংগে সম্পর্কের অর্থ হলো একটি শূন্যের সংগে কয়েকটি

---

১। "ডন" ২রা ডিসেম্বর ১৯৫৬ সন ।

২। " দৈনিক সংবাদ " ৬ই ও ৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭
শিরোনাম- কাগমারী সম্মেলনে আন্তর্জাতিক রাজনীতির উপর উপস্থাপিত মাওলানা ভাসানীর বক্তব্য ।

Dhaka University Institutional Repository



শূন্যের যোগফল আরেকটি শূন্য" । প্রধান মন্ত্রীর বক্তব্যের সমালোচনা করে ১৩ই ডিসেম্বর মাওলানা ভাসানী বলেন, "সংগঠনের ঘোষিত নীতি ও কর্মসূচী পরিবর্তনের ক্ষমতা ও অধিকার কেবল আওয়ামী লীগের কাউন্সিল সভারই রয়েছে, কোন ব্যক্তি বিশেষের নয়" । এই প্রেক্ষিতে মাওলানা ভাসানী দলের কাউন্সিল অধিবেশন আহবান করেন । "কাগমারী সম্মেলন" নামে পরিচিত এই অধিবেশনটি ১৯৫৭ সালের ৭ ও ৮ ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত হয়েছিলো । এতে ৮৯৬ জন প্রতিনিধি যোগদেন । সভাপতির ভাষনে একুশ দফার ভিত্তিতে পূর্ব আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদানের দাবীর পুনরুল্লেখ করে ভাসানী এই সম্মেলনে বলেছিলেন" আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রত্যাখ্যাত হলে পূর্ব বাংলা পশ্চিম পাকিস্তানকে আস্সালামু আলাইকুম জানাবে" । তিনি অবিলম্বে সকল সামরিক চুক্তি ও যুদ্ধ জোট বাতিলেরও দাবী জানিয়ে বলেছিলেন, "আমি কোন প্রকার যুদ্ধ জোটে বিশ্বাস করি না । বিশ্বশান্তির পরিপন্থী যে কোন প্রকার যুদ্ধ জোট মানব সভ্যতা ও মুক্তির পথে বাঁধা স্বরূপ ।"[২]

প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী তার ভাষনে আঞ্চলিকতা এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাবের সমালোচনা করে স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে ভিত্তিহীন আখ্যা দিয়ে বলেন," শাসনতন্ত্রে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য শতকরা ১৮ ভাগ স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে ।[৩] পররাষ্ট্র নীতির প্রশ্নে তিনি সময় ও অবস্থার সংগে তাল মিলিয়ে চলার আহবান জানিয়ে বলেন, "বিষয়টি বুঝতে হলে রাজনীতিকদের শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে"[৪] এই সময় কাগমারী সম্মেলনে মাওলানা ভাসানীর ভাষন এবং বিশেষ করে আসসালামু আলাইকুম এর উচ্চারন পাকিস্তানের সর্বত্র প্রচন্ড আলোড়ন তুলেছিল । সুতরাং দলের অভ্যন্তরীন সংঘাত ও বিরোধ মিটানোর যে প্রধান উদ্দেশ্য নিয়ে মাওলানা ভাসানী কাগমারী সম্মেলন আহবান করেছিলেন, আওয়ামী লীগের ক্ষমতাসীরা তাকে ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন ।

কাগমারী সম্মেলনের পর পূর্ব বাংলার পূর্ন আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন এবং পররাষ্ট্র নীতির প্রশ্নে আওয়ামী লীগ বিভক্তির পথে যেতে থাকে ।

---

৩। শাহ আমদ রেজা- "ভাসানীর কাগমারী সম্মেলন ও স্বায়ত্তশাসনের সংগ্রাম" প্রকাশক, গণপ্রকাশনী ১৯৮৬, পৃঃ ৪৪ ।

৪। 'দৈনিক সংবাদ' - ৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫৭ ।

২। আগের পাতায় দেখুন

Dhaka University Institutional Repository



১৯৫৭ সনের ১৩ই ফেব্রুয়ারী সোহরাওয়ার্দী সমর্থকদের হামলায় ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ে আহত হন ভাসানী সমর্থক অসংখ্য ছাত্র । এ দিকে ভাসানীর এন্মাগত চাপে মুখ্য মন্ত্রী আতাউর রহমান খানের সভাপতিত্বে ২রা মার্চ অনুষ্ঠিত ওয়ার্কিং কমিটির সভায় অবি-লম্বে প্রাদেশিক পরিষদে সরকারী ভাবে স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাব উত্থাপন এর সিদ্ধান্ত গ্রহীত হলেও নেতারা গড়িমসি চালাতে থাকেন এবং এর প্রতিবাদে ১৮ই মার্চ মাওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগের সভাপতির পদ থেকে অব্যাহতি নেয়ার কথা ঘোষনা করেন । দলের সাধারণ সম্পাদককে লিখিত পদত্যাগ পত্রটির বাহক অলি আহাদ শেখ মুজিবকে দেওয়ার পরিবর্তে দৈনিক সংবাদ সম্পাদকের হাতে তুলে ছেন । সেটা প্রকাশিত হলে মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় । ৩০শে মার্চ অনুষ্ঠিত ওয়ার্কিং কমিটির সভায় দলীয় শৃঙ্খলা ভংগের অভিযোগে অলি আহাদকে সাংগঠনিক সম্পাদকের পদ থেকে সাময়িক ভাবে বরখাস্ত করা হয় । প্রতিবাদে ওয়ার্কিং কমিটির উপস্থিত ৯ জন সদস্য পদ ত্যাগ করে[৫] ।

আওয়ামী লীগের ভাসানী সমর্থক সংসদ সদস্য মহিউদ্দিন আহমদ ১৯৫৭ সালের ৩রা এপ্রিল প্রাদেশিক পরিষদে বেসরকারী ভাবে স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন । তার সমর্থনে বক্তব্য রাখেন মোজাফফর আহমদ এবং আসহাব উদ্দিন আহমদ । মন্ত্রীদের মধ্যে প্রস্তাব সমর্থন করে ভাষন দেন শেখ মুজিবর রহমান । প্রস্তাবটি সর্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়ে যায় কিন্তু প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী একে বিবেচনার অযোগ্য একটি রাজনৈতিক চমক হিসেবে অভিহিত করেন ।

পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে সরকারী এই মনোভাবের প্রেক্ষিতে ৫ই এপ্রিলের ওয়ার্কিং কমিটির সভায় মাওলানা ভাসানী পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহার করতে অস্বীকার করেন । বিরাজমান খাদ্য সংকটের প্রতিবাদে এরপর প্রদেশব্যাপী আন্দোলনের প্রক্রিয়ায় ১৮ই ও ১৯শে মে তিনি বগুড়ায় কৃষক সম্মেলন আহবান করেন এবং ১লা জুন থেকে শুরু হয় তার সপ্তাহ ব্যাপী অনশন । ভাসানীর অনশন চলাকালে ৩ জুন অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সভায় সাংগঠনিক সম্পাদক অলি আহাদকে তিন বছরের জন্য বহিস্কার করা হয়, পদত্যাগী ৯ জনের স্থলে ৪ জন সম্পাদক সহ নতুন সদস্যও অন্তর্ভুক্ত করা হয় ।

---

৫। 'আওয়ামী লীগের ৩৭ বছর'- সাপ্তাহিক 'বিচিত্রা' ১৫ বর্ষ, ২৯ সংখ্যা, ২৬শে ডিসেম্বর '৮৬ পৃঃ ২৪

Dhaka University Institutional Repository



ওয়ার্কিং কমিটি ৩রা জুনের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে মাত্র দশদিনের বিজ্ঞপ্তিতে ১৩ ও ১৪ জুন ঢাকার পিকচার্স প্যালেস সিনেমা হলে আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এত কম সময়ে আয়োজিত এই বিতর্কিত অধিবেশন টিতে হাসপাতালের বিছানা থেকে ভাসানীকে নিয়ে যাওয়া হয়। অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষনে প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী নিজের অনুসৃত পররাষ্ট্র নীতির যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করেছিলেন। সোহরাওয়ার্দীর পররাষ্ট্রনীতির সমর্থনে প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন শেখ মুজিব এবং সর্ব সম্মতিক্রমে তা গৃহীত হয়ে যায়। পরদিন গুলিস্তান সিনেমা হলে আয়োজিত দ্বিতীয় অধিবেশনে ও একই প্রস্তাব উত্থাপিত এবং গৃহীত হয়েছিল। আওয়ামী লীগের এই কাউন্সিল অধিবেশনের এক প্রস্তাবে পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহার করবার জন্য ভাসানীর প্রতি অনুরোধ জানানো হয়। অন্য এক প্রস্তাবে দলীয় অংগ সংগঠন যুব লীগকে আওয়ামী লীগ থেকে বহিস্কার করা হয়। ১৬ই জুন হাসপাতাল থেকে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে ভাসানী এই কাউন্সিল অধিবেশন এবং এতে গৃহীত প্রস্তাবগুলির তীব্র সমালোচনা করে বলেন," স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের মহান আদর্শ লইয়া যে আওয়ামী লীগের জন্ম হইয়াছিল, যে আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের জনগণের হৃদয় নতুন আশার সঞ্চার করিয়া ছিল, সেই আওয়ামী লীগ ও উহার নেতাদের আদর্শ ও নীতি এই বিচ্যুতি গভীরভাবে দুঃখজনক। আওয়ামী লীগ দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের যে পতাকা তুলিয়া ধরিয়া ছিল, কাউন্সিলের এই অধিবেশন সে পতাকা অবনমিত করিয়াছে"। [৬]

এই প্রেক্ষিতে ১৭ জুন প্রচারিত এক বিবৃতিতে ভাসানী ১৯৫৭ সালের ২৫ ও ২৬ জুলাই ঢাকায় নিখিল পাকিস্তান গণতান্ত্রিক কর্মী সম্মেলন আহবান করেছিলেন। ভাসানীর এই ঘোষনা পূর্ব বাংলাসহ পাকিস্তানের সর্বত্র আওয়ামী লীগে ভাংগনের কারণ ঘটেয়েছিল। ১৩ই জুলাই এক বিবৃতিতে শেষবারের মত শেখ মুজিব এই সম্মেলনে যোগদান না করবার জন্য আওয়ামী লীগ সদস্যদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছিলেন। ২৪ জুলাই ভাসানী আওয়ামী লীগের সংগে তার সম্পর্কচ্ছেদের কথা ঘোষনা করেন। ২৫শে ও ২৬শে জুলাই ঢাকার 'রূপমহল' সিনেমা হলে অনুষ্ঠিত হয় 'নিখিল পাকিস্তান গণতান্ত্রিক কর্মী সম্মেলন'। খান আব্দুল গাফ্ফার খান, পাঞ্জাবের জননেতা মিয়া ইফতেখারুদ্দিন, বেলুচিস্তানের খান আব্দুস সামাদ আচাকজাই এবং যথারীতি খ্যাতনামা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ। এই সম্মেলনেই মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে

---

৬। অলি আহাদ-জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে '৭৫, বর্ণবন্যা মুদ্রায়ন, ঢাকা, পৃঃ ২৮১

Dhaka University Institutional Repository



গঠিত হয়েছিলো "পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি।"[৭]

আওয়ামী লীগের অন্তর্দ্বন্দ্ব :

১৯৬৩ সালের ডিসেম্বর মাসে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর আওয়ামী লীগকে পূর্ন গঠিত করবার সিদ্ধান্তটি নিয়েছিলেন শেখমুজিবর রহমান। আবুল মনসুর আহমদ এবং আতাউর রহমান খানসহ দলের প্রবীণ নেতারা এর বিরোধিতা করেছিলেন। এই উপলক্ষে সামরিক শাসনপূর্ব অভ্যান্তরীন সংঘাতও মাথা চাড়া দিয়েছিল। ১৯৬৪ সালের ২৫শে জানুয়ারী মাওলানা আব্দুর রশীদ তর্কবাগীসের সভাপতিত্বে মুজিবের বাসভবনে অনুষ্ঠিত এক প্রতিনিধি সম্মেলনে আওয়ামী লীগকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়। আতাউর রহমান খান এন,ডি,এফ-এ অবস্থান করেন এবং ৩৭ জন নেতার এক যুক্ত বি-বৃতিতে সিদ্ধান্তটিকে, শহীদ সোহরাওয়ার্দীর প্রতি অসম্মান প্রদর্শন হিসেবে বর্ণনা করা হয় এবং এর ফলে আনুষ্ঠানিকভাবে আওয়ামী লীগ দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পড়ে।[৮] আওয়ামী লীগ নাম নিয়ে উপদল গঠন করবার পরিবর্তে আতাউর রহমান, আবুল মনসুর, নুরুল আমীন, অলি আহাদ সহ দলের উল্লেখযোগ্য একটি রাজনৈতিক অংশ অতঃপর এন,ডি,এফ,কেই ক্রমশঃ রাজনৈতিক সংগঠনে পরিনত করেছিলেন।[৯] অপরদিকে আওয়ামী লীগের পুনরুজ্জীবিত হওয়া পরবর্তীকালে অত্যন্ত সফল এবং সময়োচিত পদক্ষেপ হিসাবে প্রমাণীত হয়েছিল। শাসনতন্ত্র গনতন্ত্রায়নের নামে সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে এন,ডি,এফ, পরিচালিত

---

৭। 'দৈনিক সংবাদ' ২৬শে জুলাই, ১৯৫৭ পত্রিকাটি থেকে, সারা পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক কর্মী সম্মেলনের সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গতকল্য (বৃহস্পতিবার) ঢাকায় পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি নামের একটি নতুন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান জন্ম লাভ করিয়াছে। সমগ্র পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক শক্তি সমূহের সমন্বয়ে গঠিত এই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানটির অস্তিত্বের ফলে পাকিস্তানের ইতিহাসে এক সূর্গোজ্জল সংগ্রামী।

৮। আবুল মনসুর আহমদ "আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর" নওরোজ কিতাবিস্তান ঢাকা, জুন, ১৯৭০।

৯। 'পাকিস্তান অবজারভার'- ২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬২। শিরোনাম 'জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের প্রতি সমর্থন'। ১৯৬২ সনের ২৫শে সেপ্টেম্বর আওয়ামী লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, জামাত-ই-ইসলাম, নেজামে ইসলাম এবং মুসলীম লীগের একটি অংশের সমন্বয়ে লাহোরে ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট গঠিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository


অনির্দিষ্ট এবং অস্পষ্ট তৎপরতার মুখে বিভ্রান্ত পূর্ব বাংলার একমাত্র বিরোধী দলের ভূমিকা নেবার ফলে অচিরেই আওয়ামী লীগ বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলো ।

১৯৬৪ সালের ৬ মার্চ প্রায় এক হাজার প্রতিনিধির উপস্থিতিতে ঢাকায় অনুষ্ঠিত কাউন্সিল অধিবেশন আওয়ামী লীগ পুনরুজ্জীবনের সিদ্ধান্তটি অনুমোদন করেছিলেন । এতে গৃহীত অন্যান্য প্রস্তাবে প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত জাতীয় পরিষদের মাধ্যমে নতুন শাসন তন্ত্র প্রনয়ন এবং সংসদীয় পদ্ধতির সরকার প্রতিষ্ঠার দাবী জানানো হয় । অধিবেশনে মাওলানা তর্কবাগীশকে সভাপতি এবং শেখ মুজিবকে সাধারণ সম্পাদক হিসাবে নির্বাচন করা হয়

আওয়ামী লীগের ভাংগন :

ভারত পাকিস্তান যুদ্ধের দিনগুলিতে অরক্ষিত পূব বাংলার অনিশ্চয়তার বিষয়টিকে উপ-লক্ষ্য করে প্রতিরক্ষা ও স্বায়ত্তশাসনের অত্যাবশ্যকীয় অধিকারের দাবিকে প্রধান কর্মসূচীতে পরিণত করে আওয়ামী লীগ নতুন পর্যায়ে তার যাত্রা শুরু করে । লাহোরে আয়োজিত বিরোধী দলগুলির জাতীয় সম্মেলনে শেখ মুজিবর রহমান উপস্থিত করলেন ৬ দফা কর্মসূচী ।[১০] স্বল্পকালের মধ্যেই ৬ দফা কর্মসূচী সমগ্র পাকিস্তানে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে । এর সমর্থনে জনমতও গড়ে উঠতে শুরু করে । আন্দোলনকে ব্যাপক ভিত্তিক করবার উদ্দেশ্যে শেখ মুজিব এ সময় ১লা মার্চ ঢাকায় আয়োজিত হয়েছিল সামরিক শাসনোত্তর কালের বৃহত্তম কাউন্সিল অধিবেশন । ১৪৪৩ জন প্রতিনিধির উপস্থিতিতে এই অধিবেশনেই 'বাংগালীর বাঁচার দাবি' হিসেবে ৬ দফা কর্মসূচীকে গ্রহণ করা হয় এবং শেখ মুজিবর রহমান প্রথমবারের মত সংগঠনের সভাপতি নির্বাচিত হন । তাজুদ্দিন আহমদকে অধিবেশনে সাধারণ সম্পাদক করা হয় । একই সংগে মিজানুর রহমান চৌধুরীকে সাংগঠনিক সম্পাদক ও আমেনা বেগমকে মহিলা বিষয়ক সম্পাদক করা হয় ।[১১]

কাউন্সিল অধিবেশনের পর থেকেই শেখ মুজিবর সহ আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ পূর্ব বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ৬ দফার প্রচার অভিযান শুরু করেন । এপ্রিলে এই প্রচারনা ব্যাপকভাবে

---

১০। ৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬ । শিরোনাম - " আমাদের বাঁচার দাবী ৬ দফা কর্মসূচী"- পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামীলীগ, প্রকাশক - আবদুল মমিন, প্রচার সম্পাদক, ৫১ পুরানা পল্টন ঢাকা থেকে প্রকাশিত ।

১১। মিজানুর রহমান চৌধুরীর সংগে ৫ই মে ১৯৮৮ সনে গৃহীত সাক্ষাৎকার ।

Dhaka University Institutional Repository



জনপ্রিয়তা লাভ করলে সরকারী নির্যাতনের পরিমান ও বৃদ্ধি পায়। সিলেট, ময়মনসিংহ এবং ঢাকায় মুজিবকে পর পর কয়েকবার গ্রেফতার করা হয়েছিল। তখন, গ্রেফতার, জামিন এবং আবার গ্রেফতারের প্রক্রিয়ায় নারায়নগঞ্জের একটি জনসভায় 'আপত্তিকর' বক্তব্য রাখাবার অভিযোগে' ৬৬ সালের ৯মে মুজিবের বিরুদ্ধে পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইনের ৩২ তম ধারা প্রয়োগ করা হয় এবং তিনি দীর্ঘ কালের জন্য বন্দী হয়ে পড়েন। আওয়ামী লীগের উল্লেখ যোগ্য অন্য নেতাদেরও সে সময় গ্রেফতার করা হয়েছিলো। খন্দকার মোশতাক আহমদ, তাজউদ্দীন আহমদ, মিজানুর রহমান চৌধুরী এই সময় দলের ৮ জন শীর্ষস্থানীয় নেতাকে জেলে যেতে হয়। এই সময় ২২শে জুলাই ওয়ার্কিং কমিটির গোপন সভায় সৈয়দ নজরুল, রফিকুদ্দিন ভুইয়া গাজী গোলাম মোস্তফা, মশিয়ুর রহমান (যশোর) নুরুল ইসলাম প্রমুখ যোগ দেন। এই সভাতেই সৈয়দ নজরুল অস্থায়ী সভাপতির এবং আমেনা বেগম ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করে ছিলেন। ৬ দফার পক্ষে প্রচার পরিচালনার অভিযোগে ১৭ই জুন 'দৈনিক ইত্তেফাক' নিষিদ্ধ ঘোষিত হয় এবং আগের দিন গ্রেফতার হন এর সম্পাদক তোফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া)। সর্বাত্মক এই গ্রেফতার ও নির্যাতনের ফলশ্রুতিতে ১৯৬৬ সালের জুন থেকে '৬৯ সালের জানুযারী পর্যন্ত সময়কালে আওয়ামীলীগ নেতৃত্বহীন এক নির্জীব সংগঠনে পরিনত হয়ে পড়লে সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং আমেনা বেগম এর অক্লান্ত পরিশ্রম অত্যন্ত ঝুঁকিপুর্ন অবস্থার মধ্যে দলকে টিকিয়ে রেখেছিলেন।

আওয়ামী লীগের এই রূপ দুঃখসময়ে দলে ভাংগন আনা হয়েছিলো। দলের কেন্দ্রীয় সভাপতি নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান এবং প্রাদেশিক সহ-সভাপতি আবদুস সালাম খানের নেতৃত্বে ৬ দফা প্রশ্নে ভিন্নমত পোষণকারী নেতৃবৃন্দ আওয়ামী লীগ নাম নিয়ে যোগ দিয়েছিলেন 'পিডিএম' এ। আওয়ামী লীগ কাউন্সিল মুসলিম লীগ, জামাতে ইসলাম, নেজামে ইসলাম পার্টি এবং এন,ডি,এফ, এর সমন্বয়ে ৮ দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে পাকিস্তান ডেমোক্র্যাটিক মুভমেন্ট গঠিত হয় ১৯৬৭ সালের ৩০শে এপ্রিল। এর ফলে আওয়ামী লীগ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। আতাউর রহমান খানের বাসায় অনুষ্ঠিত এক সভায় '৬৭ সালের ২৩শে আগষ্ট মাওলানা তর্কবাগিসকে সভাপতি এবং রাজশাহীর মুজিবর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে গঠিত দলটি পিডিএম পন্থী আওয়ামী লীগ নামে পরিচিত হয়।[১২]

---

১২। আতাউর রহমানের সংগে ১১ই জুলাই ১৯৮৭ সনে গৃহীত সাক্ষাৎকার।

Dhaka University Institutional Repository



পিডিএম পন্থী আওয়ামী লীগের জবাবে শেখ মুজিবের অনুসারীরা পাল্টা পাকিস্তান আওয়ামী লীগ গঠন করেন ১৯৬৭ সালের ২৭শে আগষ্ট । দল থেকে ৮ দফা পন্থী ১৩ জনকে বহিস্কার করা হয় । বহিস্কৃতদের মধ্যে ছিলেন সালাম খান, জহিরুদ্দীন, আব্দুর রশীদ, নরুল ইসলাম চৌধুরী, নুরুল হক প্রমুখ । ১৯৬৭ সালের ২৭শে আগষ্ট শেখ মুজিবর রহমান এবং এ, এইচ,এম, কামারুজ্জামান যথাক্রমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন । যদিও আগের প্রাদেশিক কমিটিও বহাল থাকে এবং এই অংশটি ৬৯ সাল পর্যন্ত ৬ দফা পন্থী আওয়ামী লীগ নামে পরিচিত ছিল ।

১৯৬৮ সালের জুলাই মাসে আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে আমেনা বেগম পদত্যাগ করেন । ১৯৬৯ সনের ২৭ ফেব্রুয়ারী শেখ মুজিবর রহমান জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর থেকে আমেনা বেগম এর সংঙ্গে আওয়ামী লীগ তথা ৬ দফা নিয়ে মত বিরোধ দেখা দিতে থাকে । এই বিরোধের চূড়ান্ত পরিনতিতে ২৩শে জানুয়ারী ১৯৭০ সনে তিনি আওয়ামী লীগ ছেড়ে দিয়ে আতাউর রহমান খানের জাতীয় লীগে যোগদান করেন ।[১৩]

স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের প্রথম ভাংগন ১৯৭২ :

স্বাধীন বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক, সামাজিক ও আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি, সর্বদলীয় সরকার প্রতিষ্ঠার দাবি প্রভৃতির মোকাবিলায় আওয়ামী লীগ নিয়ে আসে নতুন মতবাদ মুজিববাদ । মুজিববাদের প্রথম ঘোষনা দেন মুজিব বাহিনী নেতা তোফায়েল আহমদ ১৯৭২ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী । এই 'মুজিববাদ'ই পরে আওয়ামী লীগে সৃষ্টি করে অনুবিরোধ । তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমেদ মুজিববাদের বিরোধিতা করে বলেন, "বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চাই যাঁটি সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হবে বাংলাদেশে, অন্য কিছু হবে না" ।[১৪]

অপরদিকে আওয়ামী লীগের ছাত্রফ্রন্ট ছাত্রলীগের অভ্যন্তরে মুজিববাদের প্রশ্নেই বিরোধ তীব্র আকার ধারন করে । ১৯৭২ সনের এপ্রিল মাসে ডাকসু নির্বাচনকে সামনে রেখে আ,স,ম, আব্দুর রব ও শাহজাহান সিরাজের নেতৃত্বে, ছাত্রলীগের বামপন্থী গ্রুপ 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের'

---

১৩। 'আমার কথা'- আমেনা বেগম কর্তৃক প্রদত্ত সাক্ষাৎকার, 'বিচিত্রা'-১৫ই জুলাই ১৯৮৭

১৪। 'দৈনিক বাংলা' ২রা এপ্রিল, ১৯৭২ ।

Dhaka University Institutional Repository


শ্লোগান সহকারে বেরিয়ে আসেন । ফলে ১৯৭২ সনের ২২মে ছাত্রলীগ দ্বিধাবিভক্ত হয় । [১৫] রবরা চাইলেন বিজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র কায়েম করতে হবে এবং আব্দুল কুদ্দুস মাখন ও নূরে আলম সিদ্দিকী চাইলেন মুজিববাদ প্রতিষ্ঠা করতে হবে ।

ছাত্রলীগে ভাংগনের সাথে সাথে আওয়ামী লীগের শ্রমিক ফ্রন্ট এবং মুক্তি যোদ্ধা সংসদ ও ভাগ হয় । এই সময় ছাত্রলীগ (রব) ও শ্রমিক লীগ ৭০ সালের সরকার গঠনের আহবান জানায় এবং এক ভাষনে রব বলেন, "জীবনের সকল ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তনের জন্য জাতি কেবল আর একটি বিপ্লবের প্রস্তুতি নিচ্ছিল" । ৭২ সালে আওয়ামী লীগের ছাত্র ও শ্রমিক ফ্রন্টে ভাংগনের পর যদিও মূল আওয়ামী লীগের ভিতর কোন ভাংগন আসেনি তথাপি একথা সত্য যে, আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে তখন উপদলীয় কোন্দল পুরোমাত্রায়ই ছিল ।[১৬]

১৯৭২ সনের ১৩ জুনের ছাত্র লীগের প্রস্তাবে বলা হয়, 'মুজিববাদের ভিত্তিতে দেশের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র তৈরী করতে হবে' ১৬ই জুলাই ঢাকায় ছাত্রলীগ মাখন-সিদ্দিকী সভায় প্রস্তাব করা হয়ে "মাওবাদী বিভ্রান্ত নেতৃত্বে সিআইএ এজেন্ট দল ছাত্রলীগ নামধারী বিভ্রান্ত নেতৃত্ব পলাতক আলবদর, আল শামস, রাজাকার, শান্তিকমিটি, তিন মুসলিম লীগ, জামাত, নেজাম, জমিয়তে ওলামায়, পিডিপিসহ প্রতিক্রিয়াশীল সংগঠনগুলো ঐক্যবদ্ধভাবে মুজিববাদ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে বানচাল করতে চায় ।" ২০ আগষ্ট রজ্জাক বলেন, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের ধারকরা আদর্শ এবং মাওবাদী চক্রান্ত । এর আগে ১২ আগষ্ট অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ ভাওয়ালে বলেন, "সমাজতন্ত্রের প্রতি বাঁধা এলে গণতন্ত্র ত্যাগ করবো"।

মুজিববাদ নিয়ে এভাবেই আওয়ামী লীগের মধ্যে ক্রমশঃ অনুবিরোধ বাড়তে থাকে । নির্যাতনের অভিযোগ আনে ছাত্রলীগ (রব-সিরাজ), কাজী জাফর আহমদ ও ভাসানী ন্যাপ । '৭২ এর ১২ জুলাই ছাত্রলীগ (রব-সিরাজ) এক বিবৃতিতে বলে, 'ছাত্রকর্মী ও মুক্তি যোদ্ধাদের উপর প্রতিশোধ নির্যাতন চলছে' ।

---

১৫। Talukder Muniruzzaman-The Bangladesh Revolution and its Aftermath-Bangladesh Books International-1980, P.167.

১৬। Talukder Muniruzzaman-'Group Interests and Political changes: studies of pakistan and Bamgladesh, South Asian Publishers, New Delhi, 1982, P-134.

Dhaka University Institutional Repository



২১ জুলাই সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ও পল্টনে অনুষ্ঠিত হয় দুই ছাত্রলীগের পৃথক পৃথক সম্মেলন। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সম্মেলনের আয়োজন করে ছাত্রলীগ(মোখন-সিদ্দিকী) এটি উদ্বোধন করে শেখ মুজিবর রহমান। এখানে মুজিববাদ প্রতিষ্ঠার পুনঃ সংকল্প ঘোষনা করা হয়। ছাত্র লীগের (রব-সিরাজ) সম্মেলন হয় পল্টনে। এখানে আ,স,ম, রব বলেন, 'শ্রেণী শত্রু খতম করে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হবে। কার্ল মার্কসের পর সমাজ তন্ত্রের কোন নতুন সংজ্ঞা কেউ দিতে পারে না। সমাজ তন্ত্র সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত এবং আমাদের দেশে এই সমাজতান্ত্রিকই কায়েম করা হবে। মুজিববাদে কোন সমাজতান্ত্রিক রূপরেখা নাই।"[১৭]

আওয়ামী লীগের এই বিতর্কে শেখ মুজিবর রহমান এর আগ পর্যন্ত ছিলেন নিরপেক্ষ অথবা দ্বৈত। কিন্তু এ সম্মেলনেই তিনি প্রথম প্রকাশ্যে মুজিববাদীদের প্রতি তার অকুন্ঠ সমর্থন জানান।

১৯৭২ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর শিক্ষা দিবস উপলক্ষে পল্টন ময়দানে ছাত্রলীগ আয়োজিত জনসভায় আ,স,ম, রব -একটি পার্টি গঠন করবার ইঙ্গিত দেন। অতঃপর ১৯৭২ সালের ৩১শে অক্টোবর আওয়ামী লীগের 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের' অনুসারীরা গঠন করেন,জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল'। তাঁরা ঘোষনা করেন বৈজ্ঞানিক সমাজ তন্ত্রই তাদের লক্ষ্য। ৩১শে অক্টোবর জাসদের ৭ সদস্যের একটি আহবায়ক কমিটি গঠন করা হয়। কমিটিতে যুগ্ম আহবায়ক ছিলেন সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত মেজর জলিল এবং প্রাক্তন ছাত্রনেতা আ,স,ম, আব্দুর রব। সদস্যরা হলেন, শাহজাহান সিরাজ, নুরে আলম জিকু বিধান কৃষ্ণ সেন, সুলতান উদ্দীন আহমেদ এবং রহমত আলী। '২৪ ডিসেম্বর একটা কাউন্সিল করে ১০৫ সদস্যের সাংগঠনিক কমিটি গঠন করা হয়।[১৮]

আত্মপ্রকাশের আগে থেকেই জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের সম্ভাব্য কাঠামো আওয়ামী লীগের সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন বৈরিতা প্রকাশ করে আসছিল, এই বৈরিতার প্রকাশ সভা-সমিতি মিছিল ইত্যাদিতে সীমাবদ্ধ ছিল। মূলতঃ ছাত্রলীগ ও শ্রমিক লীগের সাংগঠনিক আওতায় আন্দোলন পরিচালিত হতো। এই সব আন্দোলন চালানোর জন্য এই সময় থেকে জাসদকে সরকারী হামলার শিকার হতে হয়। বৈরিতার ফলশ্রুতিতে জনগণের কাছে এটা আওয়ামী

---

১৭। Zillur Rahman khan "Leadership Crisis in Bangladesh The University press limited,FP.1984,P-97.

১৮। Rounrq Jahan-Bangladesh Palities:Prablems and Issues Bangladesh Books International-1980,P-82-83.

Dhaka University Institutional Repository



লীগের অর্ন্তদ্বন্দ্ব হিসেবে আর থাকলো না । নতুন সংগঠিত শক্তি হিসেবে জাসদের অভ্যুদয় ঘটলো ।

ছাত্রলীগের এক বিরাট কর্মী বাহিনী জাসদের হয়ে কাজ করবার ফলে জাসদ পার্টি হিসাবে বিস্তৃতি লাভ করে । তা ছাড়া স্বাধীনতা যুদ্ধের পর পর অন্য কোন সুগঠিত রাজনৈতিক দল না থাকায় জাসদের জনপ্রিয়তা বেড়ে যাওয়ার যথেষ্ট উপযুক্ত ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়েছিল । স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে আওয়ামী লীগের এক তরুণ অংশ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেনি কিন্তু বিশ্বাস করতো আওয়ামী লীগ জনগনের আশা আকাঙ্খা বাস্তবায়ন করতে পারবে না । তাই বিকল্প রাজনৈতিক দল হিসেবে এরা জাসদকে গ্রহণ করেন ।

১৯৭৫ সনে বাকশাল গঠন এবং পরবর্তীতে আওয়ামী লীগের ভাংগন, ১৯৭৬ সন :

বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জনের পর দেশ পরিচালনার দায়িত্ব ভার গ্রহণ করে আওয়ামী লীগ । সংসদীয় ব্যবস্থার প্রবর্তন হয় বাংলাদেশের জন্মলগ্ন থেকেই । স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্বদানকারী আওয়ামী লীগ সব সময়ই ছিলেন সংসদীয় গণতন্ত্রের পক্ষপাতী । তা ছাড়া ১৯৭৩ সনের নির্বাচনে সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করে আওয়ামী লীগ শাসন ক্ষমতার বৈধতা অর্জনে সক্ষম হলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে বহুমুখী সংকটের আবর্তে পতিত হয় । বিশেষত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণে বাংলাদেশ সংসদীয় গণতন্ত্রের আয়ু দ্রুত শেষ হয়ে আসতে থাকে ।

১৯৭৪ সালের প্রথম থেকেই দেশের অর্থনৈতিক সংকট ভয়ংকর আকার ধারন করে । অর্থনীতির সমস্ত পর্যায়ে অব্যাহত অব্যবস্থাপনা, আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি আর্ন্তজাতিক ক্ষেত্রের মুদ্রাস্ফীর্তির প্রভাব, চোরা চালান এবং সর্বোপরি দুর্ভিক্ষাবস্থা ক্ষমতা সীন আওয়ামী লীগকে সীমাহীন সমস্যার দিকে নিয়ে যেতে থাকে ।[১১]

---

১১। Emajuddin Ahmed-'Bureauceratic Elites in segmented Economic Growth: Bangladesh and Pakistan', The University Press Limited, 1980, P-150.

Dhaka University Institutional Repository


১৯৭৪ সনের মাঝামাঝি থেকে রাজনৈতিক সংকটও দেখা দেয় । দেশব্যাপী বিভিন্ন স্থানে দলবদ্ধ আত্মগোপনকারী দলসমূহে সশস্ত্র গেরিলাদের তৎপরতা চলতে থাকে অব্যাহত ভাবে । এই বৈপ্লবিক শক্তিগুলির কার্যকলাপ রাজনৈতিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতার জন্য বিপজ্জনক হয়ে উঠে ।[২০] এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭৪ সালে বিশেষ ক্ষমতা আইন প্রণীত হয় এবং এর মাধ্যমে বহুসংখ্যক ব্যক্তি ও দলীয় নেতাকে আটক করা হয় । ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বর মাসে সরকার দেশে জরুরী আইন ঘোষণা করেন এবং মৌলিক অধিকার সাময়িক ভাবে স্থগিত হয় । শেষ পর্যায়ে ১৯৭৫ সনের ২৫শে জানুয়ারী আওয়ামী লীগ দেশের সংবিধানে আমূল পরিবর্তন সাধন করে চতুর্থ সংশোধনী আইন প্রণয়ন করে এবং সংসদীয় ব্যবস্থার পরিবর্তে দেশে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার প্রবর্তন করে । এই সংশোধনীর মাধ্যমে এক দলীয় সরকার ব্যবস্থাও কায়েম করা হয় ।[২১] দলের নামকরণ করা হয় 'বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ' (বাকশাল) । অন্যান্য সমস্ত রাজনৈতিক দল বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয় । মস্কোপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি এবং ন্যাপ নিজেদের দলীয় অস্তিত্ব বিলুপ্ত করে বাকশালে যোগদান করে । তারপর পঁচাত্তরের পনরই আগষ্ট সামরিক অভ্যুত্থানে মুজিব সরকারের পতন ঘটে । এরপর থেকে বেশ কিছুদিন রাজনৈতিক দলগুলোর উপর নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকে ।

১৯৭৬ সালের ২৮ জুলাই প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক 'রাজনৈতিক দলবিধি' ৭৬ জারি করেন । একই সংগে ঘরোয়াভাবে রাজনৈতিক কার্যক্রম চালানোর অনুমতি দেয়া হয় । এই বিধি অনুসারে কোনো রাজনৈতিক দলকে তৎপরতা শুরুর আগে সরকারের কাছে তার লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী সম্বলিত মেনিফেস্টো দাখিল করতে হয় । 'সরকারী ছাড়পত্র' বা অনুমোদন লাভের পর ঐ দল রাজনীতি শুরু করতে পারবে । রাজনৈতিক দলবিধির শর্তমালা পূরণ করে ১৯৭৬ সালের নভেম্বর পর্যন্ত ৫৬টি দল অনুমোদনের আবেদন করে এবং এর মধ্যে রাজনীতি করবার অনুমোদন পায় ২১টি দল ।[২২]

---

২০। বৈপ্লবিক দলগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল, পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টি, পূর্ব বাংলার সমাজবাদী দল মার্কসবাদী-লেনিনবাদী এবং ইষ্ট বেঙ্গল কম্যুনিষ্টপার্টি মার্কসবাদী লেনিনবাদী । এই দলগুলি দ্বিতীয় বিপ্লবের মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক মুক্তি আনয়নে সচেষ্ট হয়ে উঠে ।

২১। Moudud Ahmed, Bangladesh: Era of Sheikh Mujibur Rahman university Press Ltd. First Published, November 1983. P.304.

২২। 'বিচিত্রা', ৫ম বর্ষ, ২১ সংখ্যা, ঢাকা ২২ অক্টোবর, ১৯৭৬ ।

Dhaka University Institutional Repository



১৯৭৫ এর সামরিক অভ্যুত্থানের পর ভাংগন পরিলক্ষিত হয় দেশের সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক সংগঠন আওয়ামী লীগের ভিতর। এসময় আওয়ামী লীগ ভাংগে বেশ কয়েকবার।

নিম্নে ১৯৭৬ সনে আওয়ামী লীগ যে কয়েকটি দলে ভেংগেছে এবং আওয়ামী লীগ থেকে উৎসারিত হয়ে যে, কয়েকটি পৃথক রাজনৈতিক দল গড়ে উঠেছে সেই সর্ম্পকে আলোচনা করা হলো।

বাংলাদেশ ডেমোক্রেটিক লীগ :

আওয়ামী লীগ থেকে বের হয়ে ছিয়াত্তরে খন্দকার মোশতাক 'বাংলাদেশ ডেমোক্রেটিক লীগ' নামে একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করেন। দল গঠনের পর এক সাংবাদিক সম্মেলনে খন্দকার মোশতাক বলেন," গণতন্ত্রকে রক্ষা করবার জন্যেই ১৫ই আগষ্টে অগণতান্ত্রিক উপায়ে আমাকে ক্ষমতা হাতে নিতে হয়েছে। আওয়ামী লীগ থেকে এখন কাজ করা সম্ভব নয়, সমীচীন ও নয়। আওয়ামী লীগ যতদিন গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিল ততদিন আওয়ামী লীগে ছিলাম।"[২২] ১৯৮০ তে এসে মোশতাকের সাথে দলের সাধারণ সম্পাদক শাহ মোয়াজ্জেম হোসেনের বিরোধ বেঁধে উঠলে গণতান্ত্রিক দল বিভক্ত হয়ে পড়ে।

জাতীয় জনতা পার্টি :

১৯৭৫ সালে বাকশাল গঠনের পর তার প্রতিবাদে যিনি তৎকালীন সংসদ সদস্য পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন, সেই জেনারেল (অবঃ) আতাউল গনি ওসমানী ১৯৭৬ এ এসে গঠন করেন 'জাতীয় জনতা পার্টি' নামে এক নতুন রাজনৈতিক দল। জনতা পার্টির কর্মসূচীতে বলা হয় যে, এ দল সংসদীয় ও নিয়মতান্ত্রিক পথে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার পক্ষপাতী। প্রতিষ্ঠার মাত্র অল্প কিছুদিন পর ১৯৭৮ সালের ডিসেম্বর মাসেই জনতা পার্টি বিভক্ত হয়ে পড়ে। এই বিভক্তির মূল কারণ ছিল প্রেসিডেন্ট জেনারেল ওসমানী এবং সাধারণ সম্পাদক ফেরদৌস আহমদ কোরাইশীর মধ্যে মত পার্থক্য। কোরাইশী অবশ্য পরবর্তী সময়ে নবগঠিত জাতীয়তাবাদী দলে যোগদান করেন।

---

২২। 'বিচিত্রা' ৫ম বর্ষ, ২১ সংখ্যা, ঢাকা ২২ অক্টোবর, ১৯৭৬।

Dhaka University Institutional Repository



গণ আজাদী লীগ :

এ ছাড়া আওয়ামী লীগ থেকে বের হয়ে আর যে সব নেতা নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করেন তাদের মধ্যে রয়েছেন মাওলানা আব্দুর রশীদ তর্ক বাগীস । তাঁর দলের নামকরণ করা হয় 'গণ আজাদী লীগ" তবে তর্ক বাগীসের নবগঠিত দল গণ আজাদী লীগও ১৯৭৮ এ প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময়ে ভেংগে যায় ।[২৩]

আওয়ামী লীগের ভাংগন ১৯৭৮ সন :

১৯৭৮ সনের ১২ই আগষ্ট শেখ মুজিবের মাল্য ভূষিত প্রতিকৃতির সামনে মিঞা বাসভবনের খোলা ছাদে আওয়ামী লীগ নেতা মিজানুর রহমান চৌধুরী ঘোষনা করলেন তাঁরা "খাঁটি "আওয়ামী লীগের" আর্বিভাবের কথা । এর সংগে সমাপ্ত হয়েছিল আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীন ঐক্যের । মিজান চৌধুরীর এ ঘোষনা অপ্রত্যাশিত ছিল না । ১৯৭৫ সালের মার্চ মাসে আওয়ামী লীগের "বাকশাল" গঠন এবং শেখ মুজিবের মৃত্যুর পর ১৯৭৬ সালে আব্দুল মালেক উকিলের দরবারে আবার আওয়ামী লীগের পুনরাবির্ভাব দলকে অনৈক্যের হাত থেকে শেষ পর্যন্ত ধরে রাখতে পারেনি । বিশেষ করে শেখ মুজিবের একক নেতৃত্বের শূন্যতা মালেক উকিল পুরণ করতে পারেন নাই । এরই প্রেক্ষিতে চরম কোন্দলের পর ১৯৭৬ এর ডিসেম্বর জোহরা তাজউদ্দিনকে আহবায়িকা করে ছত্রভংগ আওয়ামী লীগকে এক রাখবার চেষ্টা করা হয় । ১৯৭৬ এর ডিসেম্বর এ আহবায়ক কমিটি যদিও ধামা-চাপা দিয়ে রেখেছিল নেতৃত্বের কোন্দল, কিন্তু তা আবার প্রচন্ডভাবে আত্মপ্রকাশ করে ১৯৭৮ এর মার্চের ৩,৪ ও ৫ তারিখে দলের দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশনে । ভাংগনের হাত থেকে অবশ্য এ যাত্রাও রেহাই পায় আওয়ামী লীগ । মিজান চৌধুরী ও জোহরা তাজ উদ্দিনকে দলের প্রবীন নেতারা বাধ্য করেন আপোষ করে মালেক উকিলকে সভাপতি হিসেবে গ্রহণ করতে । কিন্তু কাউন্সিল প্রচন্ড উত্তেজনার মাঝে কোন পূর্বাংগ কমিটি গঠন না করে শেষ হয় । অর্থাৎ অনৈক্যের বীজ গুপ্তই রয়ে যায় । পরিনতিতে ৩ সপ্তাহ পর দুটো পাল্টা কমিটি গঠিত হয় । এরপর আবার আপোষ । আবার বিরোধ অনৈক্যের দ্বন্দ্ব চলতেই থাকে । দলের নীতি নির্ধারনে পুনরায় বিরোধ তীব্র হয়ে উঠে । বিরোধের কারণ বাকশালের 'দ্বিতীয় বিপ্লবকে' আঁকড়ে ধরে থাকতে হবে, না আওয়ামী লীগের চিরাচরিত

---

২৩। বিচিত্রা-৭ম বর্ষ, ৩০তম সংখ্যা, ১৯ ডিসেম্বর, ১৯৭৮ ।

Dhaka University Institutional Repository


চরিত্র সংসদীয় পথে বেঁচে থাকতে হবে । আপোষের ক্ষীণ বাসনা ছিঁড়ে যাবার উপক্রম হয় এই বিতর্কে । শোষোক্ত দলের নেতৃত্বে একরকমভাবে উঠে আসেন মিজানুর রহমান চৌধুরী ।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের এক সপ্তাহ পর দলের বর্ধিত সভায় আবার সংঘাত বাঁধে মিজান চৌধুরীর বাকশাল বিরোধিতাকে কেন্দ্র করে । মধ্যে আরেকটি উপদলের আবির্ভাব ঘটে জোহরা তাজউদ্দিনের নেতৃত্বে ।

জোহরা তাজউদ্দিনের নেতৃত্বাধীন উপদল মনে করেন বাকশাল পন্থী নেতৃত্ব বিশেষ করে মালেক উকিল, আব্দুর রাজ্জাক এবং তোফায়েল আহমেদ প্রমুখরা অত্যন্ত 'দুর্বল' সুবিধাবাদি ত্রিধাবিভক্ত এই নেতৃত্বের কোন্দল তীব্রতর রূপ নেয় অনুষ্ঠিত হওয়াকিং কমিটির সভায় । ফলে তাংগন অত্যাসন্ন হয়ে উঠে । দ্বিধাবিভক্ত ছাত্র লীগের তাংগন উপলক্ষ করে পারস্পরিক দোষারোপ এবং ঝগড়ার মধ্যে দিয়ে কোন প্রস্তাব পাশ না করেই সভাকক্ষ ত্যাগ করেন তিন উপদলের নেতৃবৃন্দ ।

অবশেষে মিজানুর রহমান চৌধুরী 'খাঁটি' আওয়ামী লীগের আহবায়ক কমিটি ঘোষনা করেন । সুতরাং দীর্ঘদিন তীব্র উপদলীয় কোন্দলের পর ১১ই আগষ্ট ১৯৭৮ আওয়ামী লীগ দ্বিধাবিভক্ত হয় । মিজান চৌধুরী দাবি করেন তাঁর দল হচ্ছে আদি ও অকৃত্রিম আওয়ামী লীগ ।

নতুন কমিটি গঠন করে তিনি সাংবাদিক সম্মেলন আহবান করেন ১২ই আগষ্ট । ঐদিন অপর আওয়ামী লীগের কর্মকর্তাদের এক সভা অনুষ্ঠিত হবার কথা ছিল । কিন্তু অনিবার্য রাজনৈতিক কারণে মিজানুর রহমান চৌধুরীর সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবার পরের দিন সে সভা অনুষ্ঠিত হয় ।

সাংবাদিক সম্মেলনে মিজান চৌধুরী বলেন যে ৭০ সালের আওয়ামী লীগের চরিত্রই হবে তাঁর দলের চরিত্র । যারা আওয়ামী লীগের গোড়া থেকে দলের সংগে আছেন এবং সংসদীয় নির্বাচনে দাঁড়ানোর সংগতি রাখেন তারা সবাই একত্রিত হয়েছিলেন তার দলে । মিজানুর রহমান চৌধুরীর সংগে উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে ছিলেন ছাত্রলীগের প্রাক্তন সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকী/আওয়ামী লীগ(মিজান) এর সভাপতি হলেন মিজানুর রহমান চৌধুরী এবং সাধারণ সম্পাদক হলেন অধ্যাপক ইউসুফ আলী ।

Dhaka University Institutional Repository



মিজানুর রহমান আওয়ামী লীগের অপর অংশ সম্পর্কে মন্তব্য প্রসংগে বলেন, "ওটাতো আওয়ামী লীগই নয়। ওটা বাকশাল। ওটাতো গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না। ওরা বিশ্বাস করে এক দলীয় শাসন ব্যবস্থায়"। [২৪] তিনি দুটি বিপরীতমুখী মতাদর্শে বিশ্বাসী আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীন দ্বন্দ্ব ও কলহের ৮ টি নজির তুলে ধরেন। যেমনঃ-

১। গত মার্চের কাউন্সিল সভায় একদল লাল ফিতাধারীর উচ্ছৃংখলতা, কর্মী ও নেতাদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা, বিশৃঙ্খলা পরিবেশ ইত্যাদি অধিবেশনকে একটি বেদনা-দায়ক প্রহসনে পরিনত করে। এজন্য দলীয় ম্যানিফেস্টোও উপস্থাপন করা সম্ভব হয় নাই।

২। অধিবেশনের তিন সপ্তাহ পর কার্যকরী কমিটির নাম ঘোষনা ও সাধারণ সম্পাদকের পাল্টা কমিটি ঘোষনা।

৩। ২৬শে মার্চ সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে প্রবীণ নেতাদের লাঞ্ছনা ও অবমাননা।

৪। এপ্রিল মাসের সভায় বাকশাল গঠন একটি সঠিক পদক্ষেপ বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

৫। পরবর্তী সভাগুলোয় কিছু ব্যক্তির ভূমিকায় একথা স্পষ্ট হয় তারা পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রে আদৌ বিশ্বাসী নয়।

৬। এই পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে নতুন করে কাউন্সিল অধিবেশনের প্রস্তাব প্রত্যাখান।

৭। সাধারণ সম্পাদক ও তার অনুসারীদের দ্বারা ছাত্রলীগকে তিনভাগে বিভক্তকরণ।

৮। শ্রমিক লীগের ভাংগন সৃষ্টি।

একই সংগে বাকশাল গঠনকে শেখমুজিবের 'একপেরিমেন্ট' বলে আখ্যায়িত করে মিজান চৌধুরী বলেন যে তারা বাকশাল বিরোধী বলেই নতুন দল গঠন করেছেন।

সুতরাং ১৯৭৬ এ আওয়ামী লীগকে পুর্নগঠিত করার উদ্যোগে আব্দুর রাজ্জাক, মিজানুর রহমান চৌধুরী, মহি উদ্দীন আহমদ ও মোল্লা জালাল উদ্দীন প্রমুখরা দায়িত্ব গ্রহণ করলেও দলের অভ্যন্তরে বাম ও ডান পন্থীদের তুমুল লড়াই, নেতৃত্বের কোন্দল ও আদর্শের সংঘাত দলের ভাংগনকে অনিবার্য করে তোলে।

---

২৪। সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ৭ বর্ষ, ২২ সংখ্যা, ঢাকা ৭ অক্টোবর, ১৯৭৮।

Dhaka University Institutional Repository



আওয়ামী লীগ কর্মকর্তারা ১৩ই আগষ্ট '৭৮ এক জরুরী সভায় মিজানুর রহমান চৌধুরীর সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদত্ত বক্তব্যকে বে-আইনী, অবৈধ, এখতিয়ার বর্হিভূত এবং দলীয় গঠনতন্ত্র ও শৃঙ্খলার সম্পূর্ন পরিপন্থী বলে অভিহিত করেন। একই সংগে মিজানুর রহমান চৌধুরী ও অন্যান্যদের বিরুদ্ধে গঠনতন্ত্র ও দলীয় শৃঙ্খলা বিরোধ কার্য-কলাপের জন্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এইভাবে পুনরায় ভাংগনের সম্মুখীন হয় আওয়ামী লীগ।[২৫]

আওয়ামী লীগের ভাংগন, ১৯৮৩ সন :

১৯৭৯-'৮০ ও '৮১ এ তিন বছর ধরে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতাদের মধ্যে অনুর্দলীয় বিরোধ তীব্র হয়ে দেখা দেয়। ফলে ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব ও গ্রুপিং স্পষ্ট হয়ে উঠে। এই বিরোধের প্রধান দুনায়ক হিসেবে পরবর্তীতে আর্বিভূত হন আব্দুর রাজ্জাক ও তোফায়েল আহমদ। সম্পূর্ন ভিন্ন দু' মেরুতে অবস্থানকারী এ দুনেতাকে ঘিরে মূল দলের গ্রুপিং প্রকাশ পাবার পূর্বেই অংগ সংগঠনগুলোর মধ্যে গ্রুপিং স্পষ্ট হয়ে উঠে। ছাত্রলীগ সহ যুবলীগ, কৃষক ও শ্রমিক লীগে উল্লেখিত সময়ে এর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এ অবস্থায় ১৯৮১ সালে দলের কাউন্সিল অধিবেশনকে সামনে রেখে রাজ্জাক তোফায়েল উভয়েই স্ব স্ব পক্ষ সমর্থন লাভের আশায় জোর তৎপরতা অব্যাহত রাখেন। এর পূর্বে ১০ ডিসেম্বর ১৯৭৯ সনে দলে নেতৃত্বের সংঘাত এক নতুন ধারার সৃষ্টি হয়। ন্যাপ (মো:) থেকে বেরিয়ে যাবার পর ন্যাপ (হারুন) এর একটি ব্যাপক অংশ মতিয়া চৌধুরী এবং শিবিরের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সমর্থক আনুষ্ঠানিক ভাবে আওয়ামী লীগে অনুপ্রবেশ করে। তাদের এ যোগদানে 'মস্কো লবীর' শক্তি উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়ে যায়। ফলে প্রকৃত আওয়ামী লীগদের মধ্যে অসন্তোষ বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ অসন্তোষ আরো ব্যাপক হয় 'বংগবন্ধু পরিষদ' ও 'মুক্তিযোদ্ধা সংহতি পরিষদ' দলের এ দুটি সংগঠন অনুপ্রবেশকারীদের সম্পূর্ন নিয়ন্ত্রনে চলে যাবার পর।

অসন্তোষ প্রকাশকারীদের নেতা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন দলের সাংগঠনিক সম্পাদক তোফায়েল আহমদ। পাশ্চাত্য ঘেঁষা লবীর যে অংশ দলে থেকে গিয়েছিলেন মিজান চৌধুরীর প্রস্থানের পর, তারাও এ সময় তোফায়েল আহমদের পিছনে সমর্থন দেয়।

---

২৫। সাপ্তাহিক রোববার, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১৬তম সংখ্যা, ঢাকা, ১১ ডিসেম্বর, ১৯৮৩।

Dhaka University Institutional Repository



এমনি অবস্থায় দলের ঢাকা নগর কাউন্সিলে শক্তি পরীক্ষা হয় দু'পক্ষের । আব্দুর রাজ্জাকের সমর্থকরা নগর কমিটিতে তাদের শক্তি সংহত করেন ।

এ পটভূমিতে ৩রা মার্চ ১৯৮০ নির্ধারিত হয় দলের জাতীয় কাউন্সিল । কিন্তু বিভিন্ন সংগঠনের জেলা কাউন্সিলগুলোর নির্বাচন এ সংকটের কারণে অনুষ্ঠিত না হবার ফলে পিছিয়ে যায় এ কাউন্সিল ।

১২ই ফেব্রুয়ারী হরতালকে কেন্দ্র করে আন্দোলনের অজুহাতে ৩ মার্চ কাউন্সিল পিছানোর অন্যতম অজুহাত দেখিয়ে দলের সংকট চাপা দেবার চেষ্টা চালানো হয় । পরবর্তী কাউন্সিল এর তারিখ নির্ধারিত হয় জুন মাসে । কিন্তু মস্কো লবী আশা করেছিলেন দশ দলে কাঠামোর ভিতর থেকে 'প্রগতিশীল কর্মসূচীর' মাধ্যমে একটি জোট পূর্ণাংগভাবে বের হয়ে আসবে । ফলে জুন মাসের কাউন্সিল তারিখ আর ঘোষিত হয় নাই ।

এরপর আবার নতুন করে দলের কোন্দল বাড়তে থাকে । নতুন করে কাউন্সিল অধিবেশন ধার্য করা হয় ৩রা নভেম্বর ১৯৮০ ।

২৮ অক্টোবর ১০ দল ও ১৫ টি দলের উদ্যোগে হরতাল ডাকার আড়ালে এবং সর্বোপরি ১ নভেম্বর আওয়ামী লীগের তরফ থেকে আন্দোলনের কর্মসূচী ঘোষনা করে 'জেল হত্যা দিবসের'র আড়ালে ৩রা নভেম্বর হরতাল এককভাবে দলের পক্ষ থেকে ডাকা হয় । আবার কাউন্সিল এর তারিখ দেয়া হয় ২৩ ডিসেম্বর । কিন্তু নেতারা কাউন্সিলের আগে ঐক্য মতে আসতে ব্যর্থ হন । এ ব্যর্থতার কারণে আবার ২ ডিসেম্বর কাউন্সিল পুনরায় ধার্য করা হয় ১৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৮১ সনে ।

এরমধ্যে ২ টি গ্রুপের নেতৃত্বের কোন্দল ভিতরে ভিতরে তীব্রতর হতে থাকে ও পরিস্থিতি সংঘর্ষের দিকে যেতে থাকে । এর পরিনতিতে জানুয়ারীতে দেশের বিভিন্নস্থানে দলের কর্মীদের মধ্যে মারপিট ঘটতে থাকে ।[২৬]

আব্দুর রাজ্জাক ১৯৭৮ এর পর পরই তোর নিজস্ব 'ক্যাডার' গঠনের মাধ্যমে দলের ভিতর প্রচন্ড শক্তি সঞ্চয় করেন । অন্যদিকে তোফায়েল আহমদের পিছনে দলের প্রবীন নেতারা স্বকীয়তা এবং নিজেদের প্রাধান্য বজায়রাখবার চেষ্টা চালান ।

---

২৬। দৈনিক ইত্তেফাক- জানুয়ারী ১০, ১৯৮২ । তা ছাড়া সমসাময়িক প্রতিটি দৈনিকে মারপিটের খবর প্রকাশিত হয়েছিল ।

Dhaka University Institutional Repository



২৯শে জানুয়ারী ওয়াকিং কমিটির নেতৃবৃন্দ কার্যালয়ে বৈঠক ফেলে অন্যত্র মিলিত হয় । এ বৈঠক মুলতবী ঘোষনার পরই ওয়াকিং কমিটি কার্যত দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায় । এ ব্যাপারে প্রথম উদ্যোগ নেয় রাজ্জাক গ্রুপ পৃথক বৈঠক করে । সেখানে তারা বিশ্লেষন করে দেখেন বিরোধী গ্রুপটিকে দল থেকে বের করে দেবার যথাযথ সময় এসেছে । এই বৈঠকের পরিনতি একটি প্যানেলের জন্ম দেয়, যেখানে তোফায়েল সহ কিছু নেতা বাদ যান । এর জবাবে তোফায়েল গ্রুপ একটি পাল্টা প্যানেল তৈরী করেন যেখানে রাজ্জাকসহ কিছু নেতা বাদ যান । সুতরাং শুধু বাকী থাকে দল বিভক্তির আনুষ্ঠানিক ঘোষনা ।

এর পর থেকেই পরিস্থিতি দ্রুত বদলাতে থাকে । আন্তর্জাতিক চাপ বা উপদেশের মুখে রাজ্জাক গ্রুপ ফয়সালার প্রস্তাবে সাড়া দেয় । তা ছাড়া মারমুখি উত্তেজনার মুখেও আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বাধীন অংশ প্রথমতঃ দলে শক্তি বেশী থাকা সত্বেও দলের বিভক্তি শেষ অবধি এড়িয়ে যেতে মধ্যস্থতা বৈঠকে যোগ দেন ।

এ মধ্যস্থতার ব্যবস্থা করেন দুপক্ষের মাঝে প্রাচীন নেতাদের একটি অংশ । এতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন প্রাক্তন মন্ত্রী ডঃ কামাল হোসেন এবং বিরোধী দলের নেতা আসাদুজ্জামান খান প্রমুখেরা । দলের সভাপতি আব্দুল মালেক উকিল প্রথমে আব্দুর রাজ্জাকের অংশের সংগে ঝুঁকে পড়লেও পরে তোফায়েল আহমেদের সংগেও একটা সম্পর্ক বজায় রাখেন এবং শেষের দিকে বিরোধ মধ্যস্থতাকারীদের সংগে যোগ দেন ।

ডঃ কামাল হোসেনকে এক পর্যায়ে সভাপতি এবং আব্দুর রাজ্জাককে সম্পাদক করে একটা ফয়সালার চেষ্টা চালানো হয় ২ ফেব্রুয়ারী দলের শাসনতন্ত্র ও ম্যানিফেস্টো কমিটির বৈঠকে ।

ধারাবাহিক ভাবে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট এ কমিটি আপোষ প্রচেষ্টা চালিয়ে যান, । কার্যত শাসনতন্ত্র সংশোধনের জন্য এ কমিটি দলের বিভিন্ন নেতৃবৃন্দের বৈঠক চালালেও আলোচনা মূলতঃ আপোষ ফর্মুলা খুঁজে বের করবার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে ।

৬ ই ফেব্রুয়ারী নেতারানেতৃত্বের বর্তমান পদ্ধতি বদল করে প্রেসিডিয়াম এবং সেক্রেটারীয়েট গঠন করে বর্তমান সংকট নিরসনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন । এটা করা হয়েছে একক নেতৃত্বের বদলে যৌথ নেতৃত্ব দাঁড় করাবার । কিন্তু এ সিদ্ধান্ত ঐকাবদ্ধভাবে গৃহীত হলেও ৯ই ফেব্রুয়ারী আহূত ওয়াকিং কমিটি অতঃপর ১১ ফেব্রুয়ারী বর্ধিত সভায়

Dhaka University Institutional Repository



সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে চূড়ান্তভাবে কাউন্সিল ১৪ ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত হবে ।

১৯৮১ সনের ১৪,১৫ ও ১৬ ই ফেব্রুয়ারী তীব্র উত্তেজনার মুখে দলীয় ঐক্য বজায় রাখবার জন্য ঐক্যের প্রতীক হিসাবে শেখ মুজিবের জ্যেষ্ঠা কন্যা শেখ হাসিনাকে দলীয় সভানেত্রী করা হয় । ডঃ কামাল হোসেন কাউন্সিলের শেষদিনে প্রস্তাব করেন সভানেত্রী হিসাবে শেখ হাসিনার নাম । সকলের কাছে 'সমঝোতার নেত্রী' হিসাবে শেখ হাসিনাকে গ্রহণ করা হয় ।[২৭]

কিন্তু কিছুদিন পরেই শেখ হাসিনা তাঁর নিরপেক্ষ ভূমিকা থেকে ডঃ কামাল হোসেন, কোরবান আলী, তোফায়েল আহমদ ও জোহরা তাজউদ্দীনের সহযোগিতায় রাজ্জাকের বিপরীতে চলে যান ।

১৯৮১ সালে ছাত্রলীগ দ্বিধাবিভক্ত হওয়ার পর ৮৩ সনের ১০ই জুন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের দুদিন ব্যাপী বর্ধিত সভায় ছাত্রলীগ ( জালাল-জাহাংগীর ) গ্রুপ দলের অংগ সংগঠন হিসেবে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দানের পর আওয়ামী লীগে অনুর্দলীয় বিরোধ চরমে উঠে ।

শেখ হসিনা দলীয় কোন্দলকে বাড়িয়ে দিয়ে যান নারায়নগঞ্জে আওয়ামী লীগ নেতা আহমদ চুনকার বাড়িতে ইফতার পার্টিতে যোগদান করে । এরে আব্দুর রাজ্জাকের পন্থীদের কেউ উপস্থিত ছিলেন না ।

১৯৮৩ সনের ২৯ জুন রাজ্জাকের বাস ভবনে ঢাকা নগর আওয়ামী লীগ কর্মীদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় ইফতার সমাবেশ । এখানে প্রদত্ত আব্দুল মালেক উকিলের ভাষন ফিপ্ত করে তোলে হাসিনা পন্থীদের । যদিও মালেকউকিল ছাত্রলীগ প্রশ্নে হাসিনার নাম উল্লেখ করেন নি কিন্তু তার ইংগিত ছিল সুস্পষ্ট । তিনি বলেন," কর্মীদের ইচ্ছা ও স্রোতের বিরুদ্ধে রাজনীতি করে বংশানুক্রমিক ভাবে নেতা হওয়া যায় না, যদি তাই হতো তাহলে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর কন্যা বেগম আখতার সোলায়মান ই আওয়ামী লীগের নেত্রী হতেন ।"[২৮]

রাজ্জাক এই সময় প্রবল চাপের সম্মুখীন হন তার অনুসারীদের কাছ থেকে । শেষ ফায়সলা করে, অনুসারীদের ভাষায় 'প্রতিক্রিয়াশীলদের' সংগে সম্পর্ক ত্যাগ করে সমাজতন্ত্রের

---

২৭। রোববার, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১৩ সংখ্যা, ২০শে নভেম্বর, ১৯৮০ ।

২৮। দৈনিক ইত্তেফাক, ২৯শে জুন, ১৯৮৩ ।

Dhaka University Institutional Repository



তথা রাকশালের কর্মসূচী নিয়ে এগিয়ে যাবার দাবী জানান হয় । এই পরিস্থিতিতে ১১ জুন দলীয় কার্যালয়ে ওয়ার্কিং কমিটির সভায় 'জালাল-জাহাংগীরকে' স্বীকৃতি দেবার বিষয়ে বিরোধীতা করে কর্মীদের 'এগিয়ে চল' শ্লোগানের মধ্যে বেরিয়ে যান রাজ্জাক সেই থেকে তিনি দলীয় কার্যালয়ে কাজ কর্ম প্রায় বন্ধ করে তার বাড়ির কাছাকাছি অস্থায়ী দফতর স্থাপন করেন ।

এর পর চলতে থাকে 'স্নায়ুযুদ্ধ' বিবৃতির লড়াই এবং জেলা পর্যায়ের নেতাদের সমর্থন আদায়ের প্রচেষ্টা ।

এমনি অবস্থায় শেখ হাসিনা ১৮ জুলাই প্রেসিডিয়ামের সভা ডাকেন । দলের এক অংশের নেতাদের সাম্প্রতিক বক্তৃতা বিবৃতি সম্পর্কে আলোচনার পর রাজ্জাকের মন্তব্য অনুযায়ী প্রেসিডিয়ামের সভা সিদ্ধান্ত ছাড়াই শেষ হয় । অবি শেখ হাসিনার মতেসভায় ৪ জন প্রেসিডিয়াম সদস্য আবদুল মালেক উকিল, মহি উদ্দীন আহমেদ , মোমিন তালুক-দার এবং আবদুর রাজ্জাকের নিন্দা করা হয় । তা ছাড়া উদ্ভত পরিস্থিতি সমাধানে ৩১শে জুলাই ও ১লা আগষ্ট ওয়ার্কিং কমিটির বর্ধিত সভা ডাকার সিদ্ধান্ত নেয়া হয় । কিন্তু রাজ্জাক দাবী করেন কোরবান আলীর বাড়িতে বসে ১৯ জুলাই এ ধরনের সিদ্ধান্ত বর্ণিত একটি প্রেস রিলিজ তৈরী করে সংবাদ পত্রে পাঠানো হয়েছে ।

এ সভা ডাকা নিয়ে শুরু হয় শেষ পর্যায়ের বিরোধ । রাজ্জাক সভানেত্রীকে অনুরোধ করেন সভা ১৫ আগষ্টের পর ডাকতে , কিন্তু শেখ হাসিনা সভানেত্রীর পদাধিকার বলে সভা আহবান করেন ।

এ পর্যায়ে রাজ্জাককে পরিত্যাগকারী আবদুল জলিল, মতিয়া চৌধুরী, মনোয়েম সরকার প্রচেষ্টা চালান সমঝোতার শেষ অবধি রাজ্জাক হাসিনার কথামত প্রেসিডিয়ামের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সভা ডাকা হয়েছে এ শর্ত মেনে নিয়ে চুক্তি নামায়সই করেন মালেক উকিলের বাড়িতে রাত ১১ টায় ।

এর আগে তার সংগে ৩ ঘন্টা আলোচনা হয় হাসিনার সংগে কোন কয়সালা ছাড়া । কিন্তু সভা স্থগিত রাখবার চুক্তিতে হাসিনার সই তার পক্ষে মধ্যস্থতাকারীরা যোগাড় করতে পারেন নাই । রাজ্জাকের ভাষায়," সভানেত্রীকে তোর চারটা অবধি খুঁজে পাওয়া যায় নাই "।[২৯]

---

২৯। সাপ্তাহিক রোববার, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১৬তম সংখ্যা, ঢাকা, ১১ ডিসেম্বর, ১৯৮৩ ।

Dhaka University Institutional Repository

ফলে অনিবার্য ভাবে দল ভাংগনের প্রক্রিয়া শেষ হয়। তবে এর পূর্বে প্রথমে কারণ দর্শাও নোটিশ বিনিময় ও সদস্য পদ খারিজ এবং পরে বহিষ্কারের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

একদিকে হাসিনার গ্রুপে ৫৩ সদস্য বিশিষ্ট ওয়ার্কিং কমিটির ৪৯ জনের মধ্যে হাজির ছিলেন ৩৩ জন এবং সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, আবদুল মালেক উকিল, মহিউদ্দিন, মোমিন তালুকদার, আবদুর রাজ্জাক, সৈয়দ আহমেদ ও এস,এম, ইউসুফ সহ ১৯ জনের বিরুদ্ধে সাময়িক বহিষ্কার ও 'কারণ দর্শাও' নোটিশ প্রদান করা হোক। একই সংগে তাদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়ার হয়।

অপরদিকে ৩ আগষ্ট আবদুর রাজ্জাকের বাসভবনে অনুষ্ঠিত মালেক উকিলের সভাপতিত্বে ওয়ার্কিং কমিটির জরুরী সভায় শেখ হাসিনা বাদে ডঃ কামাল হোসেন, আবদুস সামাদ আযাদ, কোরবান আলী, আবদুল মান্নান, জোহরা তাজউদ্দীন, জিল্লুর রহমান সহ ৬ জন প্রেসিডিয়াম সদস্য এবং তোফায়েল আহমদ, সাজেদা চৌধুরী, আমীর হোসেন আমুকে সেক্রেটারী পদ থেকে সাসপেন্ড করা হয় 'দলীয় শৃংখলা বিরোধী কার্যকলাপের' অভিযোগে।[৩০]

এইভাবে দল ভাংগনের সর্বশেষ পর্যায় সমাপ্ত করা হয়। সেই সংগে সমাপ্ত হয়ে যায় আওয়ামী লীগের এখন পর্যন্ত সর্বশেষ ভাংগন।

আবদুল মালেক উকিল পরে অনুতপ্ত হয়ে ও অপরাধ স্বীকার করে হাসিনার দলে ফিরে যান।

১৯৮৩ সনের অক্টোবর মাসে রাজ্জাক গ্রুপের বিশেষ কাউন্সিল অধিবেশনে দলের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ' বা 'বাকশাল'।[৩১] মহিউদ্দিন আহমদকে দলের সভাপতি বানানো হয় এবং দলের পরিচালনায় তিনটি মূলনীতির কথা ঘোষনা করা হয়। যেমন :-

(১) কার্যকর অর্থে যৌথ নেতৃত্ব।

(২) গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকতার নীতি অনুসরন।

(৩) সমাজ প্রগতির লড়াইয়ে যথাযথভাবে শ্রেণী মিত্র চিহ্নিত করন।

---

৩০। দৈনিক ইত্তেফাক, ১১ই নভেম্বর, ১৯৮৩।

৩১। Bangladesh Today, 11th November, 1983.

Dhaka University Institutional Repository



এইভাবে ১৯৪৯ সনে প্রতিষ্ঠিত আওয়ামী মুসলীম লীগ এবং পরে ১৯৫৫ সনে অসাম্প্রদায়িকীকরণের মধ্যদিয়ে প্রতিষ্ঠিত আওয়ামী লীগ তার দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় বিভিন্ন সময়ে ভাংগনের সম্মুখীন হয়েছে । একই সংগে তীব্র উপদলীয় কোন্দল ও অর্নুদ্বন্দ্বেও উপনীত হয়েছে অনেকবার । কিন্তু সঠিক সিদ্ধান্ত, ক্যারিজমাসুলভ নেতৃত্ব এবং আলোচনা ও সমঝোতার নীতি গ্রহণের মধ্যদিয়ে এই সমস্ত দলীয়কোন্দলকে দমন করা সম্ভব হয়েছে । তবে কোন্দলের মাত্রা তীব্র আকার ধারণ করলে সমাধান করা যখন আর সম্ভব হয়নি তখনই দলে ভাংগন এসেছে এবং পরিণতিতে নতুন দলের জন্ম হয়েছে ।

এই অধ্যায়ে আমি জন্মলগ্ন থেকে আওয়ামী লীগ যে কয়বার ভাংগনের সম্মুখীন হয়েছে এবং দলীয়কোন্দল বা অর্নুদ্বন্দ্বে উপনীত হয়েছে তা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছি । এই সমস্ত ভাংগনের পিছনে কখনও কাজ করেছে আদর্শের দ্বন্দ্ব, নেতৃত্বের সংঘাত, নীতির পার্থক্য কিংবা কখনও একচ্ছত্র আধিপত্যের বিরোধীতা এবং কর্মসূচী বাস্তবায়নে দ্বিমত পোষণ ।

Dhaka University Institutional Repository

## চতুর্থ অধ্যায়

### সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও ফলাফল বিশ্লেষন ।

আমি সংগৃহীত তথ্যাবলীর সত্যতা যাচাই করবার জন্য সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছি । এক্ষেত্রে রাজনৈতিক দল ভাঙ্গনের বিভিন্ন তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য আমাকে একটি নির্দিষ্ট প্রশ্নমালা বহি (Questionnaire) প্রণয়ন করে প্রয়োগ করতে হয়েছে । উল্লেখ্য যে প্রস্তুত প্রশ্নমালা প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তন করে সম্পূরক প্রশ্নাদির মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করেছি । প্রশ্নমালা বহিতে আমি ১৫টি প্রশ্ন তৈরী করে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছি । সাক্ষাৎকার গ্রহণের ক্ষেত্রে আমি আওয়ামী লীগের সংগে জড়িত ৪০ জন নেতা কর্মী ও সদস্যদের বাছাই করেছি এবং তাদের মতামত লিপিবদ্ধ করেছি ।

পরিশেষে সংগৃহীত উপাত্তসমূহ বিন্যাস ও বিশ্লেষন করতে পরিসংখ্যানমূলক বিশ্লেষন পদ্ধতি ( Statistical-Analytical Method ) বিশেষ করে ঘটনা ভিত্তিক বিশ্লেষন পদ্ধতি ( Case Analysis Method ) অনুসরন করেছি । প্রাপ্ত তথ্যগুলির পরিসংখ্যান অর্থাৎ শতকরা হার বের করে সারণীতে ঢেলে সাজিয়েছি ।

সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য আমি ৪০ জন সদস্য বাছাই করবার সময় তাদের বয়স, রাজনীতিতে অভিজ্ঞতা, দলে পদ মর্যাদা ভিত্তিক স্থান এবং রাজধানী ভিত্তিক, শহর ভিত্তিক ও গ্রাম ভিত্তিক সদস্য ইত্যাদি বিষয়গুলির দিকে গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টি রেখেছি ।

এখানে উল্লেখ্য যে, সাক্ষাৎকার গ্রহণের আওতায় যারা ছিলেন তাদের অনেকে উত্তরদানে অনীহা প্রকাশ করেছিলেন । আবার আমাকে অনেক উত্তরদানকারীর নিকট একাধিকবার যেতে হয়েছে । স্বভাবতই দ্রুত তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে এটাছিল এক বিরাট বাঁধা ।

এ ছাড়া সদস্যদের তথ্য প্রকাশ করবার ব্যাপারে অহেতুক ভয় ছিল । কারণ অনেকে ভেবেছিলেন আমি গোয়েন্দা বিভাগের লোক এবং কৌশলে তাদের গোপন খবর সংগ্রহ করতে এসেছি । আবার কোন কোন সাক্ষাৎদানকারী অপ্রাসংগিক পশ্নে জর্জরিত করে আমাকে বিড়ম্বিত করেছেন ।

Dhaka University Institutional Repository



উপরোক্ত সমস্যাবলীর ব্যাপারে সাক্ষাৎদানকারীদের আমার গবেষণা প্রকল্পের উদ্দেশ্য বিশদভাবে বুঝিয়ে তাদের ভুল ধারনা থেকে বিরত করেছি ।

আমার ৪০ জন বাছাইকৃত সাক্ষাৎদানকারীর মধ্যে রয়েছেন শেখ হাসিনা ওয়াজেদ ( আওয়ামী লীগের বর্তমান সভাপতি ) ডঃ কামাল হোসেন, তোফায়েল আহমদ, মোঃ কামরুজ্জামান এবং আব্দুস সামাদ আজাদের মত খ্যাতনামা আওয়ামী লীগের অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ এবং অপরদিকে খোন্দকার মোশ্তাক আহমদ (প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি) এবং আতাউর রহমান খানের (প্রাক্তন মুখ্য মন্ত্রী ও প্রধান মন্ত্রী ) মত প্রবীন অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদদ্বয় যারা দীর্ঘদিন আওয়ামী লীগের সংগে জড়িত ছিলেন ।

উল্লেখিত নেতৃবৃন্দের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করতে পেরে আমি যথেষ্ট উপকৃত হয়েছি এবং তাদের মতামত আমার গবেষণা জরীপের ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্য বহন করেছে ।

নিম্নে আমার সাক্ষাৎকারগ্রহণ করেছি তাঁদেরকে বয়সের দিক থেকে তিনভাগে ভাগ করেছি এবং এদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পেশার ভিত্তিতেও ভাগ করা হয়েছে ।

সরনী - ১

| সংখ্যা | বয়স | শিক্ষা | পেশা |
|---|---|---|---|
| ১১<br>২৭·৫% | ২৫-৪০ | বি,এ, | ব্যবসা |
| ২০<br>৫০% | ৪১-৫৫ | বি,এ, বি,এল<br>ও এম,এ, | আইনজীবি |
| ৯<br>২২·৫% | ৫৬-তদূর্ধ | বিবিধ | বিবিধ |

মোট - ৪০

উল্লিখিত সরনীতে দেখা যাচ্ছে যে মোট ৪০ জনের মধ্যে ১১ জনের বয়স হচ্ছে ২৫ থেকে ৪০ এর মধ্যে অর্থাৎ শতকরা ২৭·৫% জন এই বয়সের আওতায় পড়ছেন । শিক্ষাগত যোগ্যতার দিক থেকে এরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট এবং রাজনীতির

Dhaka University Institutional Repository

সংগে সংগে ব্যবসার সংগেও জড়িত আছেন ।

মোট ২০ জনের বয়স ৪১ থেকে ৫৫ বছরের মধ্যে তাঁরা শিক্ষাগত যোগ্যতার দিক থেকে বি,এ,বি,এল এবং এম,এ । রাজনীতির সংগে সংগে তাঁরা আইন ব্যবসার সংগে যুক্ত রয়েছেন । এদের সংখ্যা শতকরা ৫০ জন ।

মোট ৯ জনের বয়স হচ্ছে ৫৬ এবং তার উপরে । তবে এই ৯ জনের সকলের শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং পেশা এক নয় । তাই তাদেরকে বিবিধ কলামের মধ্যে রাখা হয়েছে । এদের কেউ ডাক্তার ছিলেন, কেউ ব্যাংকার ছিলেন, আবার কেউ আইন ব্যবসার সংগে জড়িত ছিলেন । বর্তমানে শুধুমাত্র রাজনীতির সংগেই যুক্ত রয়েছেন । শতকরা ২২·৫ জন রয়েছেন এই বয়সের ।

২। আওয়ামী লীগে যোগদান :

সাক্ষাৎকার প্রদানকারীদের কাছে আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল আওয়ামী লীগে আপনারা কবে যোগ দিয়েছেন ?

সরণী-২

| সংখ্যা | ১৯৪৯ সন থেকে | ১৯৫২-৫৮ মধ্যে | ১৯৬৬-৬৮ মধ্যে | ১৯৭০ ও পরবর্তী সময় |
|---|---|---|---|---|
| ৪ | ৪ | | | |
| ১৬ | | ১৬ | | |
| ১০ | | | ১০ | |
| ১০ | | | | ১০ |
| মোট ৪০ | ১০% | ৪০% | ২৫% | ২৫% |

সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে ৪০ জন সদস্য বিভিন্ন সময়ে আওয়ামী লীগে যোগ দিয়েছেন । এর মধ্যে ৪ জন সদস্য পূর্ব থেকে মুসলীম লীগের সদস্য ছিলেন এবং পাকিস্তান আন্দোলনেও যোগদিয়েছিলেন । এর পরে ১৯৪৭ সনে পাকিস্তান সৃষ্টি হলে যখন ১৯৪৯ সনে আওয়ামী মুসলীম লীগের জন্ম হয় তখন তারা এই দলটিতে যোগ দেন । ১৯৪৯ সনে যাদের মুস্তাক আহমদ ও আতাউর রহমান খানের নাম এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য । যদিও এখন তাঁরা দুই জনেই আওয়ামী লীগ থেকে সরে এসে পৃথক রাজনৈতিক দল গঠন করেছেন ।

Dhaka University Institutional Repository



সুতরাং দলটির জন্মলগ্ন থেকে তাঁরা জড়িত ছিলেন ।

মোট ১৬ জন অর্থাৎ শতকরা ৪০% জন সদস্য ১৯৫২-৫৭ সনের মধ্যে আওয়ামী লীগের সংগে জড়িত হয়েছেন । ১৯৫২ সনের ভাষা আন্দোলন এবং ১৯৫৪ সনের যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনের পরে এবং ৫৫ সনে দলটিকে অসাম্প্রদায়িকীকরণ করা হলে অনেকে এই দলটিতে যোগদেন ।

১৯৬৬ সনের আওয়ামী লীগের ছয় দফার জনপ্রিয়তা যখন ব্যাপক সাড়া জাগায় এবং এরই জের ধরে ১৯৬৭-৬৮ সনে আইয়ুব বিরোধী গণ অভ্যুত্থানকে কেন্দ্র করে ১০ জন সদস্য অর্থাৎ শতকরা ২৫% জন সদস্য এই সময়ে আওয়ামী লীগে যোগদেন এদের মধ্যে তোফায়েল আহমদের নাম উল্লেখযোগ্য[২]। ছাত্র আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তিনি পরবর্তীতে আওয়ামী লীগে যোগদান করেন ।

১৯৭০ সন এবং স্বাধীন বাংলাদেশের রাজনীতিতে মোট ১০ জন অর্থাৎ শতকরা ২৫% জন আওয়ামী লীগে যোগ দিয়েছেন । এরা প্রায় সবাই বয়সে তরুণ ।

৩। আওয়ামী লীগে যোগ দেবার কারণ :

আমি সাক্ষাৎদানকারীদের এ পর্যায়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম তারা দলটির কোন বৈশিষ্ট্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এই দলে যোগ দিয়েছেন । অপরাপর দলগুলিতে কেন যোগ দেন নি ?

সারণী-৩

| কারণ | সংখ্যা | শতকরা |
|---|---|---|
| বিরোধী দল হিসাবে ভূমিকা | ৬ | ১৫% |
| জাতীয়তাবাদী চরিত্র | ১২ | ৩০% |
| গণতান্ত্রিক বিশ্বাস | ১৬ | ৪০% |
| বলিষ্ঠ নেতৃত্ব | ৬ | ১৫% |
| | ৪০ | ১০০% |

১। খন্দকার মুশতাক আহমেদের সংগে গৃহীত সাক্ষাৎকার ২৬শে আগষ্ট ,১৯৮৮ ইং
আতাউর রহমানের সংগে গৃহীত সাক্ষাৎকার ৩রা অক্টোবর, ১৯৮৭ ইং

২। তোফায়েল আহমদের সংগে গৃহীত সাক্ষাৎকার ১লা জানুয়ারী, ১৯৮৮ ইং

Dhaka University Institutional Repository



উপরোক্ত সারনী থেকে যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাহলো অধিকাংশ সদস্য অর্থাৎ শতকরা ৪০ জন সদস্য আওয়ামী লীগে যোগ দিয়েছিলেন দলটির গণতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে মোট ১২ জন সদস্য অর্থাৎ শতকরা ৩০% জন আওয়ামী লীগে যোগ দিয়েছেন দলটির জাতীয়তাবাদে দিক্ষিত হয় । বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের চরম প্রকাশ ঘটবে দলের মধ্য দিয়ে এই বিশ্বাস নিয়ে দলটিতে যোগ দিয়েছেন এরাঁ ।

আওয়ামী লীগের বলিষ্ঠ নেতৃত্বের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে শতকরা ১৫% জন সদস্য আওয়ামী লীগে যোগ দিয়েছেন । এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এই ৬ জন সদস্যই ১৯৭০ সনের পূর্বে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বের প্রতি আস্থাশীল হয়ে এই দলে যোগ দিয়েছিলেন ।

অপেক্ষাকৃত নবীন ও তরুন ৬ জন সদস্য ১৯৭৪ সন পর্য্যন্ত ছাত্র রাজনীতির সংগে জড়িত ছিলেন এবং পরবর্তীতে তারা সরকারের বিরুদ্ধে বিরোধী দলের ভূমিকাকে প্রাণবন্ত করার উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগে যোগ দেন । তাদের সংখ্যা হচ্ছে শতকরা ১৫% জন ।

সাক্ষাৎদানকারী এই ৪০ জন সদস্যের মধ্যে পরে অবশ্য বিভিন্ন কারনে কয়েকজন আওয়ামী লীগ থেকে চলে যান ।

৪। আওয়ামী লীগ দলটির ভংগনের কারন :

আমি সাক্ষাৎদানকারীদের নিকট জানতে চেয়েছিলাম যে জন্মলগ্ন থেকে এখন পর্যন্ত আওয়ামী লীগ দলটি কি কি কারনে ভেংগে গেছে এবং বিভিন্ন সময়ে আওয়ামী লীগের মধ্যে যে দল ভংগনের বিপর্যয় দেখা দিয়েছে তাঁরা এর কারন হিসাবে কোন গুলিকে গুরুত্বের ক্রমানুসারে চিহ্নিত করতে চান । তাদেরকে যে সমস্ত কারনগুলি প্রদান করা হয়েছিল সেগুলি থেকে নিম্নোক্ত ফলাফল আমি লাভ করছি ।

Dhaka University Institutional Repository



সারণী - ৪

| কারণ সমূহ | ১৯৫৭ | ১৯৬৪ | ১৯৭২ | ১৯৭৬ | ১৯৭৮ | ১৯৮৩ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| আদর্শ ও নীতির সংঘাত | ২০<br>৫০% | ১৮<br>৪৫% | ২০<br>৫০% | ১৬<br>৪০% | ২<br>৫% | ২<br>৫% |
| নেতৃত্বের কোন্দল | ৮<br>২০% | ৩<br>৮.৫৭ | | | ১৮<br>৪৫% | ১৬<br>৪০% |
| আন্তর্জাতিক শক্তির প্রভাব | ১<br>২.৭৮ | | ১২<br>৩০% | ৬<br>১৫% | | |
| পার্টি প্রধানের আধিপত্যমূলক মনোভাব | | | | | | |
| উপদলীয় কোন্দল ও মতবিরোধ | | ৪<br>১০% | | ৮<br>২০% | ৮<br>২০% | ৪<br>১০% |
| ক্ষমতার মোহ | ১<br>২.৭৮ | | | | ২<br>৫% | ৬<br>১৫% |
| লক্ষ্য ও কর্মসূচী প্রয়োজনে মত বিরোধ | ৬<br>১৫% | ১০<br>২৫% | ৮<br>২০% | ১০<br>২৫% | | |
| দলের কাম্যমানের পদ লাভে ব্যর্থতা | | | | | ১০%<br>২৫% | ১২<br>৩০% |
| মোট | ৩৬+৪ | ৩৫+৫ | ৪০ | ৪০ | ৪০ | ৪০ |

উপরোক্ত সারণী থেকে বোঝা যাচ্ছে যে সাক্ষাৎদান কারীগণ বিভিন্ন সময়ের ভাংগনকে বিভিন্ন কারণের ভিত্তিতে চিহ্নিত করেছেন। তবে ১৯৫৭ সনের আওয়ামী লীগের প্রথম ভাংগনের কারণ সম্পর্কে ৪ জন সদস্য "সুস্পষ্ট ধারনা নাই" বলে উল্লেখ করেছেন। এখানে উল্লেখ্য যে এই ৪ জন সদস্যই বয়েসে নবীন। ১৯৫৭ সনের ভাংগনের সবচেয়ে প্রধান কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে আদর্শ ও নীতির সংঘাতকে। ২০ জন সদস্য অর্থাৎ ৫০% সদস্য এর পক্ষে মত দিয়েছেন। শতকরা ২০ জন সদস্য মনে করেন উক্ত সময়ে সোহরাদ্দী ও ভাসানীর মধ্যে নেতৃত্ব নিয়ে কোন্দল দেখা দেয় এবং পরিনতিতে দল ভাংগন অপরিহার্য হয়ে উঠে। তবে ৬ জন সদস্যের অর্থাৎ ১৫% জনের বিশ্বাস সোহরাওয়াদী কর্তৃক গৃহীত পররাষ্ট্র নীতির সংগে একমত হতে না পারার দরুন

Dhaka University Institutional Repository


দলে ভাংগন এসেছে । ভাসানী মনে করেছিলেন আওয়ামী লীগ তার লক্ষ্য ও আদর্শ থেকে বিচ্যুতি হয়ে পড়েছে । অপরদিকে ২.৭৮ অর্থাৎ মাত্র ১ জন সদস্য ক্ষমতার মোহকে এবং মাত্র ১ জন সদস্য আন্তর্জাতিক কারণকে চিহ্নিত করেছেন ।

১৯৬৪ সনে শেখ মুজিবর রহমান যখন আওয়ামী লীগকে পুনরুজ্জীবিত করতে চাইলেন তখন আতাউর রহমান সহ দলের প্রধান নেতারা এর বিরোধিতা করলেন । তারা সোহরাওয়ার্দীর আদর্শকে ধরে রেখে জাতীয় গণতান্ত্রিক আন্দোলন গঠন করলেন । অপরদিকে শেখ মুজিব আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব গ্রহণ করে এনডিএফ থেকে সরে এলেন । এই বিষয়কে কেন্দ্র করে শতকরা ৪৫ জন বা ১৮ জন সদস্য অভিমত প্রকাশ করেছেন যে এই মতবিরোধিতার পিছনে আদর্শ ও নীতির সংঘাতই বড় ছিল । তবে ১০ জন সদস্য অর্থাৎ ২৫% জন মত প্রকাশ করেছেন যে, লক্ষ্য ও কর্মসূচী প্রনয়নে মত বিরোধিতার কারণে উক্ত সময়ে মত ভিন্নতা দেখা দেয় ।

৩ জনের মতে এই সময় নবীন ও প্রবীনের মধ্যকার বিরোধী দলের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে । শেখ মুজিবরের নেতৃত্বে নবীন গ্রুপটির সংগে আতাউর রহমান সহ অপরাপর প্রধান নেতাদের দলীয় নেতৃত্ব নিয়ে অলিখিত দ্বন্দ্ব এই ধরনের সমস্যার সৃষ্টি করে । শতকরায় এদের হার হলো ৮.৫৭ জন ।

৪০ জন সদস্যের মধ্যে ৫ জন এই প্রশ্নের উত্তর দিতে অপারগতা প্রকাশ করেছেন । তারা এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন নাই ।

১৯৭২ সনে জাতীয় সমাজতান্ত্রীক দল গঠনের কারণ হিসবে ২০ জন সদস্য অর্থাৎ শতকরা ৫০% জন মত প্রকাশ করেছেন যে, এই ভাংগন এর পিছনে আর্দশ ও সংঘাতের নীতিই প্রধান । বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রকে কেন্দ্র করে বিরোধের সূত্র পাত ।
শতকরা ৩০% জনের মত হলো আন্তর্জাতিক শক্তির প্রভাবে এই সময়ে আওয়ামী লীগে দ্বন্দ্ব দেখা দেয় । এদের সংখ্যা হলো ১২ জন । অপরদিকে ৮ জন সদস্য মত দিয়েছেন যে সমাজতন্ত্র বাস্তবায়নের কর্মসূচীকে কেন্দ্র করে দলেবিভক্তি নেমে এসে । শতকরা এর হার ২০%।

Dhaka University Institutional Repository



গৃহীত উপাত্ত থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৭৬ সনের আওয়ামী লীগে যে ভাংগন দেখা দেয় তার কারণ হিসাবে শতকরা ৪০% জনই মত প্রকাশ করেছেন যে এই ভাংগনের পিছনেও আর্দশ ও নীতির সংঘাতই প্রধান । তাদের মতে ১৯৭৫ সনে বাকশাল গঠনকে কেন্দ্র করে যে সংঘাত দেখা দিয়েছিল '৭৬ সনে দলটিকে 'রাজনৈতিক দলবিধিতে' অধীনে পুনরুজ্জীবিত করা হলেও অনেকে দলটি থেকে সরে গিয়ে নতুন দল গঠন করেন । শতকরা ২৫% জন মত দিয়েছেন যে, লক্ষ্য ও কর্মসূচী প্রনয়নে বিরোধ দেখা দিলে আওয়ামী লীগে ভাংগন দেখা দেয় । তবে ৮ জন সদস্য অর্থাৎ ২০% জন সদস্যের মত হলো দলের ভিতরের কোন্দলই এই বিপর্যয়ের জন্য দায়ী । একই সংগে ১৫% সদস্য বা ৬ জন সদস্যের মতে আনুর্জাতিক প্রভাবের কারণে দলটিতে বিপর্যয় দেখা দেয় । বিশেষত এরা খন্দকার মোস্তাক আহমদ পরিচালিত ডেমোক্র্যাটিক লীগ গঠনকে আনুর্জাতিক শক্তিসৃষ্ট সৃষ্টি বলে আখ্যায়িত করেছেন ।

১৯৭৮ সনে মিজানুর রহমান চৌধুরীর নেতৃত্বে আরেকটি আওয়ামী লীগ সৃষ্টি হলে দলে যে ভাংগন দেখা দেয় এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৮ জন সদস্য বা ৪৫% সদস্য বলেন যে এর পিছনে নেতৃত্বের কোন্দলই ছিল প্রধান । তবে ১০ জন সদস্য মত প্রকাশ করেন যে এই ভাংগনের পিছনে দলে কাম্যমানের পদ লাভে ব্যর্থতাই দলে ভাংগন ডেকে এনেছে শতকরা এদের সংখ্যা ২৫% । আর ৮ জন সদস্য এর মতে দলের অভ্যন্তরে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের কোন্দল ও মত বিরোধ দলের ভাংগন ত্বরান্বিত করে । শতকরা ৫% জন অর্থাৎ ২ জনের মতে ক্ষমতার মোহ এবং শতকরা এবং শতকরা ৫% জনের মতে নীতির সংঘাতের ফলে ১৯৭৮ সনে দলে ভাংগন দেখা দেয় ।

১৯৮৩ সনের দল ভাংগনের কারণ হিসাবে সংখ্যা গরিষ্ঠ ১৬ জন সদস্য অর্থাৎ শতকরা ৪০% জন মত প্রকাশ করেন যে নেতৃত্বের কোন্দলই দলে ভাংগন ডেকে আনে । আওয়ামী লীগের ভিতরে নেতৃত্ব নিয়ে যে কোন্দল চলছিল এই ভাংগন তারই বহিঃপ্রকাশ অপরদিকে শতকরা ৩০% জন অর্থাৎ ১২ জনের মতে দলে কাম্য মানের পদলাভে ব্যর্থতাই দলে বিপর্যয় ডেকে আনে । তবে ৬ জন সদস্য বা ১৫% বলেছেন ক্ষমতার মোহ দলে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছে এবং ৪ জনের মতে উপদলীয় কোন্দল ও মতবিরোধ ও ২ জন সদস্যের মতে আর্দ ও নীতিই ছিল '৮৩ সনের দল ভাংগনের প্রধান কারণ । শতকরা পদের হিসাব যথাক্রমে ১০% এবং ৫% জন ।

Dhaka University Institutional Repository

৫। বাকশাল গঠন দল ভাংগনের অন্যতম কারণ কিনা

আমরা এই প্রশ্নের উত্তরে আমি নিম্নোক্ত ফলাফল লাভ করেছি ।

সারনী-৫

| মতামত | সংখ্যা | শতকরা |
|---|---|---|
| হ্যাঁ | ১২ | ৩০% |
| না | ২৮ | ৭০% |

সাক্ষাৎকার গ্রহণের ফলাফল থেকে দেখা যায় যে অধিক সংখ্যক সদস্যই দল ভাংগনের কারণ হিসাবে 'বাকশাল' গঠনকে অন্যতম কারণ বলে স্বীকার করেন না। তাদের মতে ১৯৭৫ সনে বাকশাল গঠন করবার ফলে আওয়ামী লীগ ভাংগেনি বরং পরবর্তীতে নেতৃত্ব ক্ষমতার মোহ কিংবা আর্দশের সংঘাতে দলটি ভেংগে ছিল। শতকরা ৭০% জন এই ধরনের মতামত ব্যক্ত করেছেন । অপরদিকে ১২ জন সদস্য অর্থাৎ শতকরা ৩০% জন অভিমত প্রকাশ করেন যে 'বাকশাল' গঠনই পরবর্তীতে দলটিতে ভাংগন এনেছিল। কারণ এই পদক্ষেপটি গণতান্ত্রিক ছিল না । ফলে আদর্শের সংঘাত দেখা দিলে অনেকে দলত্যাগ করেন । সম্ভবতই দলে তখন ভাংগন দেখা দেয় ।

৬। বংগবন্ধুর মৃত্যু দলের কোনদিকটিতে অধিক শূন্যতা এনে দিয়েছে :

নির্বাচিত ৪০ জন সদস্যের সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় যখন জানতে চাওয়া হয়েছিল যে, বংগবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের মৃত্যু দলটিতে কিভাবে শূন্যতা এনেদিয়েছে অর্থাৎ তাঁর মৃত্যু দলটির কোনদিকে অধিক শূন্যতা এনে দেয় এর উত্তরে আমি যে ফলাফল লাভ করি তা নিম্নের সরনীতে তুলে ধরলাম ।

সরনী-৬

| দলীয় নেতৃত্ব | দলীয় সংগঠন | দলীয় ঐক্য | দলীয় লক্ষ্য ও কর্মসূচী প্রণয়নে ঐকমত |
|---|---|---|---|
| ২২ | ৫ | ১১ | ২ |
| ৫৫% | ১২.৫% | ২৭.৫% | ৫% |

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত সরনী থেকে যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাহলো সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য অর্থাৎ শতকরা ৫৫% জন সাক্ষাৎকারীই স্বীকার করেছেন যে বংগবন্ধু শেখ মুজিবের মৃত্যুতে দলীয় নেতৃত্বদানের ক্ষেত্রেই অধিক শূন্যতা এনে দিয়েছে । তারা উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করেছেন '৭৫ পর দলে যতগুলি ভাংগন এনেছে এগুলির মুলে রয়েছে বলিষ্ঠ নেতৃত্বদানের অভাব । অপরদিকে ১১ জন সদস্য অর্থাৎ শতকরা ১৭·৫% জন অবশ্য বলেছেন শেখ মুজিবের মৃত্যু দলীয় ঐক্য আনায়নের ক্ষেত্রে অধিক শূন্যতা এনে দিয়েছে । তাদের মতে, "[illegible] একতার প্রতীক", সুতরাং আওয়ামী লীগ দলটি এদিক থেকে তার অভাব তীব্রভাবে অনুভব করছে ।

সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে শতকরা ১২·৫% জন সদস্য মনে করেন দলীয় সংগঠনের ক্ষেত্রেই তাঁর অভাব বেশী অনুভুত হচ্ছে । দলকে গ্রাম পর্যায় থেকে জেলা পর্যায় এবং রাজধানী পর্যায় সংগঠন করতে যে সমস্যা দেখা দিচ্ছে তার পিছনে বংগবন্ধুর মৃত্যুই উল্লেখযোগ্য কারণ । তবে মাত্র ২ জন অর্থাৎ শতকরা ৫% জন সদস্য মনে করেন দলীয় লক্ষ্য ও কর্মসূচী প্রনয়নে যে সমস্যা দেখা দিচ্ছে তাতে মনে হয় বংগবন্ধুর মৃত্যু দলের এদিকটাতেই অধিক অভাব এনেদিয়েছে ।

৭। <u>বর্তমান আওয়ামী লীগের দূর্বল দিক কোনটি :</u>

সাক্ষাৎপ্রদান কারীদের নিকট আমার প্রশ্ন ছিল বর্তমানে আওয়ামী লীগের সবচেয়ে দূর্বল দিক হিসাবে তারা কোন কারণটিকে উল্লেখ করতে চান । প্রশ্নের উত্তরে তাঁরা যে মতামত প্রকাশ করেছেন সেগুলিকে নিম্নোক্ত সরনীর মাধ্যমে তুলে ধরা হলো ।

<u>সরনী-৭</u>

| কারণ সমূহ | সংখ্যা | শতকরা |
|---|---|---|
| নবীন ও প্রবীন সদস্যদের মধ্যে দৃষ্টি ভংগির পার্থক্য | ৩ | ৭·৫% |
| ব্যক্তি নেতৃত্ব রাজনীতিতে প্রাধান্য পাচ্ছে | ৪ | ১০% |
| নেতৃবৃন্দের মধ্যে কোন্দল | ২৪ | ৬০% |
| গঠনমূলক কর্মসূচী প্রনয়নের অভাব | ৯ | ২২·৫% |

সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে যে নেতৃবৃন্দের কোন্দলই বর্তমানে আওয়ামী লীগের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দূর্বল দি[illegible] শতকরা ৬০% জন অর্থাৎ ২৪ জন সদস্য মনে করেন দলের অভ্যন্তরে

Dhaka University Institutional Repository

নেতৃবৃন্দের মধ্যে ক্ষমতা ও নেতৃত্ব নিয়ে প্রতিনিয়ত যে কোন্দল চলেছে তা আওয়ামী লীগের একতা বা সংহতিকে বার বার হুমকীর সম্মুখীন করে ফেলেছে ।

শতকরা ২২.৫% জনের অভিমত ১৯৬৬ সনের ছয় দফার মত বর্তমানে আওয়ামী লীগ জনপ্রিয় , গঠনমূলক, সুসংগঠিত কর্মসূচী জনগনের সম্মুখে তুলে ধরতে পারছে না । বিভিন্ন সময়ে আওয়ামী লীগ বিভিন্ন দফা জনগনের সামনে তুলে ধরছে ( যেমন পূর্বের পাঁচ দফা, বর্তমান ১ দফা ও ৭ দফা) কিন্তু এককভাবে ব্যাপক একটা জনমত আওয়ামী লীগের পক্ষে গড়ে তোলা সম্ভব হচ্ছে না । ৪ জন সদস্যের মতে ব্যক্তি নেতৃত্ব দলীয় রাজনীতি-তে বৃদ্ধি পাচ্ছে যা আওয়ামী লীগের গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যকে বিপর্যয়ের সম্মুখীন করে ফেলতে পারে । কয়েকজনের মতে বর্তমানে আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে নবীন ও প্রবীণ সমস্যা ও নেতাদের মধ্যে যে ভাবে 'রাজনৈতিক যোগাযোগের' দূরত্বকে বাড়িয়ে দিচ্ছে তাতে দলীয় সংহতি দুর্বল হয়ে পড়েছে । যা কিছুতেই কাম্য হতে পারে না । সুতরাং এই কারণটি আওয়ামী লীগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ন দুর্বল দিক হিসাবে চিহ্নিত করা যায় । এদের শতকরা হিসাব ৭.৫% জন ।

৮। জোটের রাজনীতি কতটুকু সমর্থন যোগ্য :

বর্তমানে রাজনৈতিক প্রবাহের দিকে লক্ষ্যরেখে আমি প্রশ্ন মালায় যে প্রশ্নটি সন্নিবেশিত করেছিলাম তাহলো " জোটের রাজনীতি কতটুকু সমর্থনযোগ্য " ? এই প্রশ্নের উত্তরে আমি নিম্নোক্ত মতামত পেয়েছি ।

সারনী-৮

| মতামত | সংখ্যা | শতকরা |
|---|---|---|
| সমর্থনযোগ্য | ১০ | ২৫% |
| সমর্থনযোগ্য না | ৩০ | ৭৫% |
| মোট | ৪০ | ১০০% |

আমি সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় লক্ষ্য করেছি যে ৪০ জন সদস্য যেউই জোটের রাজনীতির সফলতা সম্পর্কে আশাবাদী নহেন । এরা এ ধরনের আন্দোলনের প্রতি সমর্থন ও দিতে চান না । যদিও সমীক্ষায় আমরা দেখতে পাচ্ছি মোট ১০ জন সদস্য বা ২৫% সদস্য জোটের রাজনীতি সমর্থন করেছেন এবং এর পক্ষে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন । কিন্তু

Dhaka University Institutional Repository

অধিক সংখ্যক সদস্য অর্থাৎ যেমন ৩০ জন সদস্য অর্থাৎ শতকরা ৭৫% জন সদস্যই সুস্পষ্ট স্বীকার করেছেন তারা জোটের রাজনীতি সমর্থন করেন না এবং এই ধরনের আন্দোলন কোন সফলতা আনতে পারে না। তথাপি পরিস্থিতি, সময় ও কৌশলগত কারণে তারা বর্তমানে জোটের রাজনীতি ও আন্দোলনকে প্রকাশ্যে সমর্থন করছেন এবং আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন।

১। বামপন্থী ও ডানপন্থী প্রভাব দলে উপদলীয় কোন্দল সৃষ্টি করছে :

সাক্ষাৎদান কারীদের নিকট আমি জানতে চেয়েছিলাম দলের অভ্যন্তরে বামপন্থী ও ডানপন্থী প্রভাব কি ধরনের উপদলীয় কোন্দল সৃষ্টি করছে। এই প্রশ্নের উত্তর হিসাবে তাদেরকে পাঁচটি উত্তরের যে কোন একটিতে মতামত দিতে বলে, তাঁদের কাছ থেকে আমি নিম্নোক্ত ফলাফল লাভ করি।

সরণী-১

| মতামত | খুববেশী | বেশী | মোটামুটি | নেই | একেবারেই নেই |
|---|---|---|---|---|---|
| সংখ্যা | ১০ | ২০ | ৮ | ২ | X |
| শতকরা | ২৫% | ৫০% | ২০% | ৫% | X |

সরণী থেকে বোঝা যাচ্ছে মাত্র ২ জন সদস্য বা ৫% ব্যতীত প্রত্যেকই স্বীকার করেছেন যে দলের অভ্যন্তরে বামপন্থী এবং ডানপন্থী প্রভাবের ব্যাপক মতবিরোধ রয়েছে, যার ফলশ্রুতিতে দলে উপদলীয় কোন্দল সৃষ্টি হচ্ছে।

পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০ জন সদস্য অর্থাৎ শতকরা ৫০% জন সদস্য মত প্রকাশ করেছেন যে দলে অবশ্যই কোন্দল রয়েছে যদি ও তা খুববেশী নয়। তাদের মতে জন্মলগ্ন থেকে আওয়ামী লীগে বামপন্থী ও ডানপন্থী যে দুটি বলয় ছিল তখন থেকে তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও বিরোধ দেখা দেয় যা আজ পর্যন্ত শেষ হয় নাই। তাঁদের মতে '৫০ সন থেকে ৫৩/৫৪ সন পর্যন্ত এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর থেকে এই দুই বলয়ের মধ্যে কোন্দল তীব্রতর হয়। অপরদিকে শতকরা ২৫% জন অর্থাৎ ১০ জন সদস্যের মতে দলের অভ্যন্তরে বামপন্থী ও ডানপন্থীদের কোন্দল মারাত্মক ও খুব বেশী। তাঁরা কয়েকবারই এ ধরনের কোন্দলের সম্মুখীন হয়ে দল ভাংগনের সম্মুখীন হয়ে পড়েছিল। উদাহরণস্বরূপ তাঁরা ১৯৮৩ সনে রাজ্জাক সমর্থিত দল বাকশাল গঠিত হবার পূর্ববর্তী পরিস্থিতি বর্ণনা

Dhaka University Institutional Repository



করেন । এমনকি তাদের মতে ১৯৫৫ সনে আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দেবার পিছনে অন্যান্যের সাথে বামপন্থী গ্রুপটিও অন্যতম দায়ী ছিল । বাকী ৮ জন সদস্য কোন্দল মোটামুটি বলে উল্লেখ করেন এবং মাত্র ২ জন সদস্য দলের অভ্যন্তরে বামপন্থী ও ডানপন্থীদের মধ্যে কোন্দল নেই বলে উল্লেখ করেছেন ।

১০। ১৯৭০ সনের পূর্বের সময়ের সংগে বর্তমান আওয়ামী লীগের প্রধান পার্থক্য হিসাবে উল্লেখযোগ্য কারণ :

বাছাইকৃত সাক্ষাৎদান কারীদের কাছে আমি জানতে চেয়েছিলাম যে, স্বাধীন বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ যে ভাবে আর কার্যএম্ম পরিচালনা করছে এর সংগে ১৯৭০ সনের পূর্বে পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের কার্যএম্মের মধ্যে সর্বাধিক পার্থক্য বলে তাঁরা কোন কারণটিকে চিহ্নিত করতে চান । এই প্রশ্নের জবাবে আমি নিম্নের ফলাফল লাভ করি ।

সরনী-১০

| কারণ সমূহ | মতামতে সংখ্যা | শতকরা |
|---|---|---|
| নেতৃত্বদানের ক্ষেত্রে | ৬ | ১৫% |
| দলীয় কোন্দল | ৭ | ১৭.৫% |
| দল ভাংগনের প্রবনতা | ১০ | ২৫% |
| ভোটের রাজনীতি | ৫ | ১২.৫% |
| গঠনমূলক কর্মসূচী প্রদানের ক্ষেত্রে | ৪ | ১০% |
| দলীয় প্রধানের অধিপত্য | ৮ | ২০% |
| মোট | ৪০ | ১০০% |

উপরোক্ত সরনী থেকে যে বিষয়টি স্পষ্ট হচ্ছে তা হলো প্রদত্ত প্রত্যেকটি কারণেরই মোটামুটি কাছাকাছি মতামত পাওয়া গেছে । তবে এর মধ্যে সর্বাধিক ১০ জন সদস্য অর্থাৎ শতকরা ২৫% জন সদস্য মত প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন, ১৯৭০ সনের পূর্বের এবং পরের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হচ্ছে স্বাধীন বাংলাদেশে আওয়ামী লীগে ১৯৭২, ১৯৭৬, ১৯৭৮ এবং ১৯৮৩ সনে ভাংগনের সম্মুখীন হয়েছে । কিন্তু তুলনামূলকভাবে ১৯৪৯ সনে আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হবার পরে ১৯৫৭ সনে একবার এবং ১৯৬৪ সনে দল পুনরুজ্জীবিত সময় কিছুটা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিল ।

Dhaka University Institutional Repository


অপরদিকে শতকরা ২০% জন সদস্য অর্থাৎ ৮ জন সদস্য মত দেন দলীয় প্রধানের আধিপত্য কারণটিতে তাদের যুক্তি হলো ১৯৭০ সনের পূর্বে দলীয় প্রধানের প্রভাব ছিল ব্যাপক এবং দৃঢ়, কিছুটা আধিপত্য মূলক । কিন্তু বর্তমানে অর্থাৎ ১৯৭৫ সনের পর থেকে এ ধরনের প্রভাব দেখা যায় না । সোহরাওয়ার্দ্দী এবং শেখমুজিবর রহমান যে ভাবে দলের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিলেন এবং দলীয় সদস্যরাও যে ভাবে পার্টি প্রধান প্রতি অনুগত ছিলেন বর্তমানে এদিকটিতে ব্যাপক পার্থক্য দেখা যায় ।

সরনীতে দেখা যাচ্ছে শতকরা ১৭.৫% জন সদস্য দলীয় কোন্দলকে পার্থক্যের কারণ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন । তাঁদের অভিমত ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তাঁরা উল্লেখ করেন যে, যদি ও ১৯৭০ সনের পূর্বেও দলীয় কোন্দল পার্টিতে ছিল কিন্তু স্বাধীনতার পরে এই কোন্দলের মাত্রা লক্ষনীয় ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে । ১৯৭২ সন থেকেই কোন্দল শুরু হয় এবং কয়েকবার দল ভাংগনের মধ্যে দিয়ে এর চরম প্রকাশ ঘটে । এখন পর্যন্ত এই ধরনের কোন্দলের মাত্রা কমেনি বরং বৃদ্ধি পাচ্ছে ।

শতকরা ১৫% জনের মত হলো ১৯৭০ সনের পূর্বে নেতৃত্বদান যে রকম ছিল বর্তমানে তার ভিন্ন চিত্র দেখা যায় । বর্তমানে দলকে যেভাবে নেতৃত্ব দেওয়া হচ্ছে এতে প্রবীন নেতারা খুব একটা সন্তুষ্ট নহেন । তাদের মতে পূর্বে দলীয় নেতৃত্ব অনেক বেশী দৃঢ় ছিল ।

শতকরা ১২.৫% জনের মত বা ৫ জন সদস্যের মত হলো জোটের রাজনীতি এখন বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে । অবশ্য পূর্বেও আওয়ামী লীগ বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক প্রয়োজনে অপরাপর দলগুলির সংগে জোটবদ্ধ হয়েছে কিন্তু বর্তমানে আওয়ামী লীগের মধ্যে জোটের রাজনীতির প্রবণতা অনেকাংশে বেড়ে গিয়েছে । বিশেষত ১৯৭৫ সনের পর থেকে এই জোটের রাজনীতি লক্ষ্যনীয় ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে ।

মাত্র শতকরা ১০% জনের অভিমত হলো পূর্বে আওয়ামী লীগ যে ভাবে গঠনমূলক কর্মসূচী জনগনের সম্মুখে তুলেধরতে পেরেছিল বর্তমানে আওয়ামী লীগ সে ধরনের জনপ্রিয় কর্মসূচী জনগনের সম্মুখে উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হচ্ছে । তারা উদাহরণ হিসাবে ছয়দফা কর্মসূচী উল্লেখ করেন । এই কর্মসূচীটিকে বাঙালী জনগন তাদের বাঁচার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেছিল এবং এই ৬ দফার মাধ্যমে সূচীতে হয়েছিল স্বাধীন বাংলাদেশ আইনের সূত্র-স্ফূর্ত গণ আন্দোলন । কিন্তু বর্তমানে এ ধরনের কর্মসূচীর অভাব দেখা দিচ্ছে । আন্দোলন-এর জন্য আওয়ামী লীগকে এখন জোটের রাজনীতির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়তে হয়েছে ।

Dhaka University Institutional Repository


১১। দলের অভ্যন্তরের উপদলীয় কোন্দল:

সাক্ষাৎপ্রদানকারীদের কাছে আমি প্রশ্ন রেখেছিলাম দলে উপদলীয় কোন্দল আছে কি না ? থাকলে এরমাত্রা কেমন ? এ ধরনের উপদলীয় কোন্দল দলের জন্য কত টুকু হুমকী স্বরূপ । প্রশ্নের উত্তর প্রদানে ৪ জন বিরত থাকেন বাকী ৩৬ জনের কাছে থেকে আমি নিম্নোক্ত ফলাফল লাভ করেছি ।

সারণী-১১

| ফলাফল | সংখ্যা | শতকরা |
|---|---|---|
| খুববেশী | ২ | ৫% |
| বেশী | ৮ | ২০% |
| মোটামুটি | ২০ | ৫০% |
| একেবারেই নেই | ৬ | ১৫% |
| মোট | ৩৬+৪=৪০ | ৯০%+১০%= =১০০% |

উল্লেখিত সরনী থেকে বোঝা যাচ্ছে যে আওয়ামী লীগ দলটিতে মোটামুটি ধরনের উপদলীয় কোন্দল রয়েছে । আমার কাছে ২০ জন সদস্য অর্থাৎ ৫০% সদস্য বলেন যে, প্রবীণ ও নবীন সদস্যদের মধ্যে দৃষ্টি ভংগীর পার্থক্য, কর্মসূচী বাস্তবায়নে ঐক্যমতহীনতা, নীতিনির্ধারন, লক্ষ্য প্রণয়ন ইত্যাদি কারণ সমূহকে কেন্দ্র করে দলে উপদল সৃষ্টি হয় এবং পরবর্তীতে কোন্দলের সৃষ্টি করে । ৮ জন সদস্যের মতে দলের অভ্যন্তরে উপদলের প্রভাব বেশী ধরনের । প্রায়ই নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের কেন্দ্র করে দলে উপদল গড়ে উঠে এবং দলীয় সংহতিতে ভাংগন দেখা দেয় । তবে ১৫% জন সদস্য মনে করেন আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে উপদলীয় কোন্দল একেবারেই নেই । অপরদিকে ২ জন সদস্য সম্পূর্ণ এর বিপরীতে অভিমত জানান অর্থাৎ আওয়ামী লীগ দলটির অভ্যন্তরে খুব বেশী পরিমানে উপদলীয় কোন্দল রয়েছে । তাদের মতে প্রাযী শোনা যায় নেতৃস্থানীয় অনেকে দলত্যাগ করছেন ।

১২। আওয়ামী লীগের জন্য উল্লেখিত সব গুলি কেন বিখ্যাত :

আমি সাক্ষাৎপ্রদান কারীদের কাছে কয়েকটি সব উল্লেখ করে তাদের কাছে জানতে চেয়েছিলাম আওয়ামণী লীগের জন্য এই সব গুলি কেন বিখ্যাত । আমার এই প্রশ্নটি করবার পিছনে প্রধান উদ্দেশ্য ছিল অপেক্ষাকৃত নবীন সদস্যরা তাদের দল সম্পর্কে কতটুকু ধারনা রাখেন । আমি এই প্রশ্নের উত্তরে নিম্নোক্ত ফলাফল পেয়েছি ।

Dhaka University Institutional Repository



সরণী-১২

| মতামত | ১৯৫৪ | ১৯৫৫ | ১৯৫৭ | ১৯৬২ | ১৯৬৬ | ১৯৭০ | ১৯৭৫ | ১৯৭৬ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| স্পষ্ট ধারনা রাখেন | ২৮<br>৭০% | ৩০<br>৭৫% | ৩৪<br>৫০% | ২০<br>১০০% | ৪০<br>১০০% | ৪০<br>১০০% | ৪০<br>১০০% | ৩৪<br>৮৫% |
| মোটামুটি ধারনা রাখেন | ৮<br>২০% | ৬<br>১০% | ৬<br>১৫% | ১২<br>৩০% | | | | ৬<br>১৫% |
| কোন ধারনা নেই | ৪<br>১০% | ৪<br>১০% | | ৮<br>২০% | | | | |

উপরোক্ত সরণী থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে পাকিস্তান আমলের প্রথম দিকের বৎসরগুলিতে আওয়ামী লীগ সম্পর্কে নবীন সদস্যদের ধারনা কিছুটা কম । এখানে এটাও উল্লেখযোগ্য যে ১৯৬৬ সনে আওয়ামী লীগ যে ছয় দফা কর্মসূচী দেয় সে সম্পর্কে সবাই ধারনা রাখলেও ছয় দফার প্রতিটি দফা সম্পর্কে অনেক নবীন সদস্যই সুস্পষ্ট ধারনা রাখেন না । ১৯৫৪ সনে প্রাদেশিক নির্বাচন অর্থাৎ যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন আওয়ামী লীগের ভূমিকা সম্পর্কে ৪ জন সদস্য কোন মতামত দিতে পারেন নাই । তেমনি ৪ জন সদস্য অর্থাৎ ১০% সদস্য ১৯৫৫ সনে আওয়ামী মুসলীম লীগ থেকে যে মুসলীম শব্দটি বাদ দেওয়া হয় এ ব্যাপারে কিছু জানেন না । তাঁরা উত্তর না দিয়ে চুপ করে ছিলেন । অবশ্য শতকরা ৭৫% জন সদস্যই এই ব্যাপারে পরিষ্কার ধারনা রাখেন । ১৯৬২ সনে ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট গঠন এবং পরবর্তীতে ১৯৬৪ সনে আওয়ামী লীগকে পুনরুজ্জীবীত করবার ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে ধরনের সংকট দেখা দিয়েছিল এ সম্পর্কে ২০% সদস্য কোন কিছু বলতে পারেন নাই । এই কয়জন ছাড়া ১২ জন সদস্য মোটামুটিভাবে কিছু বলতে পেরেছেন । ১৯৭৬ সনে রাজনৈতিক দলবিধির মাধ্যমে আওয়ামী লীগকে যে পুনরুজ্জীবিত করা হয় এই সম্পর্কে শতকরা ১৫ জন মোটামুটি বলেছেন কিন্তু পরিষ্কারভাবে যে কিছু বলতে পারেন না তা বোঝাই যাচ্ছিল । এটা উল্লেখ্য যে এ ধরনের অপারগতা প্রবীনদের মধ্যে আমি পাইনি । বরং নবীনরা অধিক সংখ্যক ক্ষেত্রে অপারগতার পরিচয় দিয়েছেন ।

১৩। বাংলাদেশে অধিক রাজনৈতিক দল সৃষ্টির কারন :

384592

আমি বাছাইকৃত সদস্যের কাছে প্রশ্ন রেখেছিলাম যে, একজন রাজনীতিবিদ হিসাবে তিনি নিম্নের কোন কারনটিকে বাংলাদেশে অধিক রাজনৈতিক দল সৃষ্টির জন্য দায়ী বলে মনে করেন ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

সরণী - ১৩

| আদর্শের সংঘাত | নেতৃত্বের কোন্দল | সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা গ্রহণ | দলে কাম্য পদ লাভে ব্যর্থতা | আনুর্জাতিক প্রভাব | ক্ষমতার লোভ |
|---|---|---|---|---|---|
| ৮ | ৬ | ১০ | ৪ | ৪ | ৮ |
| ২০% | ১৫% | ২৫% | ১০% | ১০% | ২০% |

সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশে অধিক রাজনৈতিক দল গঠনের কারন হিসাবে সর্বাধিক সদস্য অর্থাৎ শতকরা ২৫ জন মনে করেন সামরিক বাহিনী ক্ষমতা গ্রহন করলে অনেকগুলি দলে ভাংগন দেখা দেয় । কারন বিভিন্ন কারনে অনেক রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ নিজের দল থেকে কিছু সংখ্যক সমর্থক নিয়ে নতুন দলে যোগ দেন । আবার সামরিক শাসকরা প্রশাসনিক কাঠামোকে গণতন্ত্র চালু করে নিজে ক্ষমতায় থাকবার জন্য নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করেন । শতকরা ৮ জন সদস্যের মতে আর্দশের সংঘাত দেখা দিলেই দলে ভাঙ্গন দেখা দেয় । পারস্পরিক সমঝোতার অভাবের কারনে কেউ নিজের আদর্শ ত্যাগ করতে না চাইলে দলে ভাংগন অপরিহার্য হয়ে উঠে । আবার শতকরা ২০ জন অর্থাৎ ৮ জন সদস্য মনে করেন ক্ষমতার লোভই দল ভাংগনের অন্যতম কারন । স্থায়ী স্বার্থকে যখন কোন সদস্য দলীয় স্বার্থের উর্দ্ধে স্থান দেয় তখনই দলের সংহতি হুমকীর সম্মুখীন হয় । ফলে ভাংগন অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায় । নেতৃত্বের কোন্দলকে দায়ী করেছেন শতকরা ১৫% অর্থাৎ ৬ জন সদস্য । ৪ জন সদস্য মনে করেন আনুর্জাতিক প্রভাবের কারণে দলে ভাংগন আসে । তাঁরা উদাহরণ হিসাবে ১৯৭২ সনে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল গঠনকে উল্লেখ করেন । আর বাকী ৪ জন সদস্যের মতে যখন কোন প্রভাবশালী নেতা স্বীয় দলে কাম্য পদলাভে ব্যর্থ হন তখনই তিনি প্রতিবাদ স্বরূপ দল ত্যাগ করে সমর্থকদের নিয়ে নতুন আরেকটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন ।

১৪। আওয়ামী লীগের বর্তমান কর্মসূচী, গঠনতন্ত্র, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রদ্ধতি এবং লক্ষ্যকে আপনি কতটুকু সমর্থন করেন ।

সাক্ষাৎদানকারীদের কাছে এ পর্যায়ে আমি জানতে চেয়েছিলাম যে, তারা স্বীয় দলের বিভিন্ন দিক নিয়ে কতটুকু সুখী এবং কে কিভাবে একে মূল্যায়ন করবেন । এই প্রশ্নের জবাব হিসাবে আমি নিম্নোক্ত ফলাফল লাভ করি ।

Dhaka University Institutional Repository

সরণী- ১৪

| মতামত | সংখ্যা | শতকরা |
|---|---|---|
| সম্পূর্ন একমত | ২০ | ৫০% |
| অধিকাংশ সমর্থন করি | ১৬ | ৪০% |
| মোটামুটি সমর্থন করি | ২ | ৫% |
| একেবারেই না | - | - |
| মোট | ৩৮+২ | ১৫% + ৫% |

সাক্ষাৎকার গ্রহনের ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, শতকরা ৫০ জন সদস্যই আওয়ামী লীগের গৃহীত কর্মসূচী , লক্ষ্য, গঠনতন্ত্র ইত্যাদির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ একমত । তাঁদের মতে প্রতিটি পদক্ষেপই সঠিক ও নির্ভুল । ১৬ জন সদস্য অর্থাৎ শতকরা ৪০ জনের মতে সকল পদক্ষেপের প্রতিই সমর্থন রয়েছে তবে মাঝে মাঝে কিছু কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতিকে অগণতান্ত্রিক বলে মনে হয় । আবার অনেক সময় কর্মসূচী প্রণয়নের পদ্ধতিকে সঠিক বলে মনে হয় না । বাকী ২ জন সদস্য বলেন যে তারা এই সমস্ত পদক্ষেপ গুলির সাথে মোটেও একমত নহেন । তাদের মতে পূর্বের আওয়ামী লীগের সংগে এই সব ক্ষেত্রে এখন আর কোন রকম তুলনা চলে না । আর ২ জন সদস্য এই প্রশ্নের জবাব দেন নাই ।

১৫। বর্তমান নেতৃত্বে কি সঠিক ।

আমি জানতে চেয়েছিলাম আওয়ামী লীগের বর্তমান সভানেত্রীর নেতৃত্ব সম্পর্কে তারা কি রকম ভাবেন । অর্থাৎ তাঁর নেতৃত্বের প্রতি আস্থা রয়েছে কি না ? এই প্রশ্নের জবাবে আমি যে ফলাফল পেয়েছি তা নীচের সরণীতে তুলে ধরলাম ।

সরণী - ১৫

| মতামত | সংখ্যা | শতকরা |
|---|---|---|
| সম্পূর্ণ আছে | ২০ | ৫০% |
| মোটামুটি আছে | ১০ | ২৫% |
| একেবারে নেই | - | - |
| | ৩০+১০ | ৭৫%+২৫% |

Dhaka University Institutional Repository



সরণী অনুযায়ী শতকরা ৫০ জন সদস্য সম্পূর্নভাবে বর্তমান নেত্রীর প্রতি আস্থাবান এবং তাঁর প্রতি সমর্থন দিয়ে যাবেন সকল ক্ষেত্রে । শতকরা ২৫ জন অর্থাৎ ১০ জন সদস্যের মতে নেত্রীর প্রতি মোটামুটি আস্থাশীল কিন্তু বংগবন্ধুর নেতৃত্বের উপর যতটা আস্থাশীল ছিলেন বর্তমান নেত্রীর প্রতি ততটা আস্থা নেই । তাঁরা বিশদভাবে এর ব্যাখ্যা দিতে চান নাই । তবে ১০ জন সদস্য এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া থেকে বিরত থাকেন ।

তবে বলেন যে দলীয় সংহতি ও একতাই বড় কথা । দলকে যিনি একতাবদ্ধ করে রাখতে পারবেন তাঁকেই সবাই সমর্থন জানাবে । এখানে ব্যক্তিগতভাবে মত পার্থক্য থাকতে পারে কিন্তু দলের বৃহত্তর স্বার্থে স্বীয় মতামতকে গুরুত্ব না দেওয়াই উচিত ।

আমি লক্ষ্য করেছি অপেক্ষাকৃত নবীন সদস্যরা বর্তমান নেত্রীর প্রতি অধিক আস্থাশীল । তারা সভানেত্রী শেখ হাসিনার প্রতি পূর্ণ সমর্থন দানের কথা উল্লেখ করেছেন ।

Dhaka University Institutional Repository

# পঞ্চম অধ্যায়

## উপসংহার

আমি রাজনৈতিক দলের ভাংগন এবং নমুণা হিসেবে আওয়ামী লীগ সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে বিশ্লেষণ করেছি পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোয় । এই অধ্যায়ে আমি নিবন্ধের উপসংহার টানতে চেষ্টা করেছি ।

রাজনৈতিক অগ্রগতির অন্যতম মাধ্যম রাজনৈতিক দল । কিন্তু উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলগুলি ভাংগন প্রক্রিয়ায় অনবরত ভেংগে যাচ্ছে । সৃষ্টি হচ্ছে নতুন নতুন রাজনৈতিক দলের । ফলে কোন দলই রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারছে না ।

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে দল ভাংগনের কারণ বিশদভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে । উন্নত রাষ্ট্রগুলোর সংগে তুলনা করে বলা যায়, আধুনিক দলীয় ব্যবস্থায় নানা মত ও নানা পথের সমাবেশ ঘটে বলে তাতে বিতর্ক ও বিরুদ্ধতার উপস্থিতি স্বাভাবিক । উন্নত রাষ্ট্রগুলোতেও দলের অভ্যন্তরেউপদল বা Faction বর্তমান । কিন্তু যে সমস্ত দেশগুলোতে তা কখনই মাত্রা ছাড়িয়ে যায় না । ফলে সেখানকার রাজনীতিতে এগুলো কখনো সমস্যা হিসেবে দাঁড়ায় না । যে সব দেশে সমাজের বিভিন্ন স্তরে জনসাধারনের মধ্যে " এক সমন্বিত মূল্যবোধ ও চিন্তা চেতনা " গড়ে উঠেছে । দলের ভেতর উপদল গড়ে উঠলেও তার পরিণতিতে দলভেংগে বহুদল প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে না । পক্ষান্তরে আমার গবেষণায় দেখেছি আওয়ামী লীগে উপদলীয় মনোভাব ( Factionalism ) এতই অস্বাভাবিক মাত্রায় বিদ্যমান যে, দলটি এম্মাগতই ভাংগনের সম্মুখীন হয়েছে ।

১৯৪৯ সন থেকে ১৯৮৭ সন পর্যন্ত আওয়ামী লীগে দলীয় কোন্দল ও ভাংগনের একটা বিশ্লেষণমূলক খতিয়ানে দেখা যায়, এই ৩৭ বছরে আওয়ামী লীগ আদর্শগত কারণে ভেংগেছে মোট ৪ বার । প্রথমবার ১৯৫৭ সনে কাগমারী সম্মেলনের পর ভাসানীর নেতৃত্বে বামপন্থী সংগঠন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে । সোহরাওয়ার্দীর প্রধান মন্ত্রীত্ব কালে তাঁর নিজের ও আওয়ামী লীগের একাংশের সাম্রাজ্যবাদ ঘেষাঁ নীতি, তৎকালীন পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে আদর্শগত দ্বন্দ্ব তীব্র আকার ধারন করে । বামপন্থী ও প্রগতিশীলরা উক্ত সংগঠন থেকে বেরিয়ে গিয়ে ভাসানীর নেতৃত্বে ন্যাপ

Dhaka University Institutional Repository



প্রতিষ্ঠা করেন।[১]

দ্বিতীয় ভাগ হিসেবে উল্লেখ করা যায় ১৯৬৪ সনে আওয়ামী লীগের পুনরুজ্জীবনের ঘটনাকে। এই সময় অবশ্য দলে কোন ভাংগন দেখা দেয় নাই। আদর্শগত কারণে আতাউর রহমান খান 'ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট' (এন,ডি,এফ)কে ধরে রাখেন। অপরদিকে শেখ মুজিবর রহমান আওয়ামী লীগকে এন,ডি,এফ, থেকে পৃথক করে এগিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন।[২]

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর ১৯৭২ সনে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের সৃষ্টি আওয়ামী লীগের তৃতীয় ভাংগন। তৎকালীন বিরাজমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগের ভেতর যে আদর্শগত দ্বন্দ্ব চলছিল, তারই ফলে উভয় দলের নিয়ন্ত্রনাধীন ছাত্রলীগের মধ্যে বিরোধ চরম আকার ধারন করে এবং পরিশেষে বিভক্ত ঘটে। একদিকে সরকারপন্থী ছাত্রলীগ অপরদিকে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রব সিরাজ সমর্থিত ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর তারাই ভিন্ন আদর্শের ঘোষনা দিয়ে 'জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল' প্রতিষ্ঠা করেন।[৩]

১৯৭৫ সনে আওয়ামী লীগ 'বাকশাল' গঠন করলে আদর্শগত কারণে দল থেকে বেরিয়ে আসেন মাওলানা তর্কবাগীশ ও জেনারেল আতাউল গনি ওসমানী। চতুর্থবারের মত দলভেংগে সৃষ্টি হয় আরও কয়েকটি নতুন দলের।[৪]

---

১। 'দৈনিক সংবাদ' ২৬শে জুলাই, ১৯৫৭
- আবুল মনসুর আহমদ, "আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর", নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, জুন ১৯৭০।

২। 'পাকিস্তান অবজারভার' ২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬২। শিরোনাম 'জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের প্রতি সমর্থন'।

৩। 'দৈনিক বাংলা' ২রা এপ্রিল, ১৯৭২
- Talukder Maniruzzaman, "The Bangladesh Revolution and its Aftermath," Bangladesh Books International 1980, P-167.

৪। 'বিচিত্রা' - ৭ম বর্ষ, ৩০তম সংখ্যা, ১১ ডিসেম্বর, ১৯৭৮।

Dhaka University Institutional Repository


তা ছাড়া নেতৃত্বের কোন্দলের কারণে আওয়ামী মোট তিনবার ভাংগনের সম্মুখীন হয়েছিল । প্রথমতঃ বলা যায় ১৯৭৬ সনে খন্দকার মোস্তাক আহমদ আওয়ামী লীগের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে পৃথকভাবে গঠন করেন 'ডেমোক্রেটিক লীগ'।[৫] একইভাবে ১৯৭৮ সনে মিজানুর রহমান চৌধুরীর আওয়ামী লীগও গঠিত হয়েছিল মূলতঃ নেতৃত্বের কোন্দলের ফলেই । একই কারণে ১৯৮৩ সনে রাজ্জাক আওয়ামী লীগ থেকে বের হয়ে এসে গঠন করেন 'বাকশাল' নামক নতুন আরেকটি রাজনৈতিক দল ।[৬]

অরীপে প্রাপ্ত পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করে আমি যে তথ্য পেয়েছি তা থেকে বলা যায় দলে একত্রে কোন্দল বিরাজ করেছে ১৯৭২-৭৫ সনে আওয়ামী লীগের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন থাকা কালে এবং ১৯৭৫ সন থেকে পরবর্তী কালে নতুন করে মহি উদ্দীন আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে বাকশাল গঠনের মধ্যবর্তী সময়টুকুতে । উপদলীয় কোন্দলের পরিণতিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আওয়ামী লীগে যে ভাবে ভাংগন এসেছে তার মধ্যে প্রথম পর্যায়ে নতুন দলে ভাংগন এবং মাধ্যম পর্যায়ে বা তৃতীয় পর্যায়ে সৃষ্ট বিভিন্ন দলের এক বা একাধিক ভাংগন ঘটছে । আর এই তিন পর্যায়ে ভাংগনের প্রক্রিয়ায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তিন ডজনের বেশী দল ও উপদল সৃষ্টি হয়েছে । এভাবে মূল আওয়ামী লীগ থেকে বেরিয়ে আসা অংশ প্রায় ২৪টিরও বেশী দলের জন্ম দিয়েছে ।

এই প্রসংগে এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আজ আমাদের প্রতিটি রাজনৈতিক দলই ভাংগনের সম্মুখীন হচ্ছে । সবের মূলে রয়েছে আদর্শের দ্বন্দ্ব, নেতৃত্বের কোন্দল, ক্ষমতার মোহ, উচ্চ পদ লাভের বাসনা, আনুর্জাতিক প্রভাব এবং অগণতান্ত্রিক সংগঠনিক কাঠামো । এর ফলে দলে উপদলীয় কোন্দল পতই মারাত্মক আকার ধারন করেছে যে, রাজনৈতিক দলগুলি কোনভাবে প্রতিষ্ঠানিক রূপ নিতে পারছে না । এরই ফলশ্রুতিতে আমাদের গণতন্ত্রের বিকাশ বাঁধাগ্রাপ্ত হচ্ছে । আর একই সংগে ব্যাহত হচ্ছে আমাদের সকল প্রকার উন্নয়মূলক কার্যক্রম ।

একজন বিশ্লেষক বলেন " বাংলাদেশের সবকটি দলকে যদিও দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য খুবই সোচ্চার দেখা যায় তথাপি একথা সত্য, এ সব দলের ব্যবস্থাপনায় কোন গণতান্ত্রিক পরিবেশ নেই নেতৃত্ব, নেই নির্বাচন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে কোন সুষ্ঠু ব্যবস্থা । যারা একবার

---

৫। 'বিচিত্রা' - ৫ম বর্ষ, ২১ সংখ্যা, ঢাকা ২২ অক্টোবর, ১৯৭৬

৬। 'দৈনিক ইত্তেফাক', ১১ই নভেম্বর, ১৯৮৩
Bangladesh Today, 11th November,1983.

Dhaka University Institutional Repository



যারা একবার দলের নেতৃত্বে আসীন হন তারা যেমন আজীবন নেতৃত্বে থাকতে চান, তেমনি অন্যরাও চেষ্টা চালান নেতৃত্বের সেই লোভনীয় আসন দখল করার জন্য। এ কারণে দেখা যায়, প্রতিটি কাউন্সিল অধিবেশনে এসব দল একবার করে ভাংগে অথবা ভাংগনোন্মুখ হয়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, দলে মনপুতঃ পদ না পাওয়ার কারণে কেউ কেউ ক্ষুব্ধ বা হতাশ হয়ে দল ত্যাগ করে অন্য দলে যোগ দেন অথবা নিজস্ব লোকদের নিয়ে স্বতন্ত্র দল গঠন করেন"।

আমি আওয়ামী লীগ দলটির ভাংগনের কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে দল ভাংগনের কারণ সম্পর্কে কয়েকটি সাধারণ সূত্রের সন্ধান পেয়েছি।

(১) লুসিয়ান পাই বার্মার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে বলেন, সেখানে পরিবার কর্তৃক সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় পরিবারের প্রতি আনুগত্য এবং পরিবারের বাইরে সমাজের প্রতি অবিশ্বাস, সন্দেহ ও আস্থাহীনতার মনোভাব সৃষ্টি করে।[৭] আমাদের দেশেও রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া পরিবার দ্বারা প্রভাবিত হয়। ফলে আমাদের মনে সংকীর্ণতা ও কেন্দ্রীমুখতা দেখা দেয়। স্বীয় স্বার্থ রক্ষার ক্ষেত্রে আমরা তাই অপরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে পারি না। রাজনীতির এই মহন্তর অংগনেও দেখা যায় এবং প্রতিফলন। রাজনীতিতে যে পারস্পরিক অশ্রদ্ধা, অবিশ্বাস এবং অসহিষ্ণুতা দেখা যায় তার অন্যতম কারণ হচ্ছে সুষ্ঠু রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের অভাব। সাধারণভাবে আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দের মনমানসিকতায় এর প্রতিফলন দেখা যায়।

(২) বাংলাদেশের বামপন্থী-ডানপন্থী নির্বিশেষে সকল রাজনৈতিক দলে উপদলীয় কোন্দল ভাংগনের মূলে একটি কারণ হোল দলীয় নেতৃত্বে আসীন ব্যক্তিবর্গের পারস্পরিক বিদ্বেষ এবং দলে ক্ষমতাসীনের পদলাভের আকাঙ্খা। বাস্তবতার আলোকে বলা যায়, প্রতিটি দলেই একবার যারা দলের নেতৃত্বে আসীন হন, তারা যেমন আজীবন নেতৃত্বের বহাল থাকতে চান, তেমনি অন্যরাও চেষ্টা করেন নেতৃত্বের সেই লোভনীয় আসন দখল করার জন্য। ১৯৭৬ সনে জেনারেল আতাউল গনি ওসমানী গঠন করেন 'জাতীয় জনতা পার্টি' নামে এক নতুন রাজনৈতিক দল। প্রতিষ্ঠার মাত্র অল্প কিছু দিন পরেই ১৯৭৮ সনের ডিসেম্বর মাসে জনতা পার্টি বিভক্ত হয়ে পড়ে। দলের সাধারণ সম্পাদক ফেরদৌস আহমদ কোরাইশী পৃথক জনতা পার্টি (কোরায়শী) গঠন করেন এবং পরবর্তীতে তিনি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলে যোগদান করেন। ওসমানীর মৃত্যুর পর

---

৭। Lucian Pye, "Politics, Personality and Nation Building: Burma's Search for Identity, New Haven; Yale university Press 1962, P -

Dhaka University Institutional Repository


পার্টি নেতৃত্বের কোন্দলে পড়ে রিয়ার এডমিরাল (অবঃ) মোশাররফ হোসেন খানের নেতৃত্বে জাতীয় জনতা পার্টি (মোশাররফ) এবং আনোয়ারুল ওয়াদুদের নেতৃত্বে জাতীয় জনতা পার্টি (ওয়াদুদ) এ বিভক্ত হয় ।

(৩) এটা অনেকটা প্রমাণীত সত্য বলে ধরে নেওয়া যায় যে বাংলাদেশে কোন রাজনৈতিক দল সরকারীভাবে ক্ষমতাগ্রহণ করতে পারলে সে দলের নেতা,কর্মী ও সমর্থকরা অর্থনৈতিক দিক থেকে ব্যাপক সুযোগ সুবিধা অর্জনের সুযোগ পায় । ফলে সরকারী দলে যোগ দেবার প্রবণতা কাজ করে মূলতঃ দলছুট নেতা বা কর্মীদের মধ্যে । আবার একটি দলে অনেক ব্যক্তি আছেন যারা নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে হতাশ । তাই তাঁরা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশায় নিজের দলের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করে সমর্থকদের নিয়ে ক্ষমতাসীন সরকারী দলে যোগ দেন । কিন্তু তাঁদের মধ্যে উপদলীয় কোন্দলের মনোভাব থেকেই যায়, ফলে পূর্বতী দলে কোন্দল সৃষ্টি করে তারা যেমন এক সময়ে দলত্যাগ করেছিলেন, তেমনি সরকারী দলে যোগ দিয়েও উপদল সৃষ্টির চেষ্টায় থাকেন । এখানে দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায় ইউনাইটেড পিপলস্ পার্টির কথা । জেনারেল জিয়াউর রহমানের শাসনকালে এই দলের খালিদ চৌধুরী কাজী জাফর আহমদের নেতৃত্ব প্রথমে জিয়ার ফ্রন্টে যোগদান করেন । পরে উভয়েই মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করায় হায়দার আকবর খান রনো-রাশেদ খান মেনন-নাসিম আলী নেতৃত্বের সাথে তাঁদের মত বিরোধ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে । ফলে শেষোক্তরা ইউপিপি থেকে বেরিয়ে এসে ওয়ার্কার্স পার্টি গঠন করেন । পরবর্তীতে জিয়ার মৃত্যুর পর কাজী জাফর বি,এন,পি, ত্যাগ করেন এবং জেনারেল এরশাদের জাতীয় পার্টিতে যোগদিয়ে মন্ত্রীত্বের পদ গ্রহণ করেন । এর প্রতিবাদে মিয়া সাদেকুর রহমানের নেতৃত্বে ইউপিপি (জাফর) থেকে বেরিয়ে ইউপিপি (সাদেক) গঠন করেন । অপরদিকে কাজী জাফরের ইউপিপির বিলুপ্তি ঘটে ।

ঠিক তেমনি ১৯৭৮ সনে আওয়ামী লীগ থেকে সরে এসে পৃথক আরেকটি আওয়ামী লীগ (মিজান) গঠন করেছিলেন মিজানুর রহমান চৌধুরী । কিন্তু তিনি তারদল সহ যোগদেন এরশাদের জাতীয় পার্টিতে এবং পরে মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করেন । যদিও তার দলের একাংশ মুরে আলম সিদ্দীকির নেতৃত্বে দল থেকে বেরিয়ে এসে পৃথক দল গঠন করেন । পরবর্তীতে মিজান চৌধুরী তার আওয়ামী লীগ (মিজান) এর বিলুপ্তি ঘটিয়ে জাতীয় পার্টিতে যোগদেন ।[৮]

---

৮। ১৯৮৩ সনে জনদল গঠন করা হলে মিজানুর রহমান চৌধুরী এতে যোগদান করেন । পরে তিনি জাতীয় ফ্রন্টেও যোগ দেন । ১৯৮৪ সনে জাতীয় পার্টি গঠন করা হলে তিনি এ দলে যোগদান করেন এবং মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করেন ।

Dhaka University Institutional Repository

উপরের দুইটি দৃষ্টান্ত থেকে এই অভিমত পৌঁছানো যায় যে, বিপরীতমুখী দল থেকে বেরিয়ে আসা এই সমস্ত নেতাগণ এক পার্টিতে যোগদান করলেও তারা সব সময়ই দলের মধ্যে নিজের সমর্থক বৃদ্ধি করতে সচেষ্ট হন। ফলে দলের অভ্যন্তরে পারস্পরিক অবিশ্বাস, অশ্রদ্ধা ও দ্বন্দ্ব, বিরোধ বৃদ্ধি পায় এবং দলের মধ্যে উপদলীয় কোন্দল দেখা দেয়।

(৪) বাংলাদেশের অধিকাংশ রাজনৈতিক দলের সংগে ব্যাপক জনগণের কোন সম্পর্ক নেই। এর অন্যতম কারণ হোল এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলের নেতা ও কর্মীদের অবস্থান মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে সীমিত। ফলে রাজনৈতিক দলগুলি গঠিত হচ্ছে পরশ্রমজীবী অনুৎপাদক শ্রেণীর সমন্বয়ে। আর তাই পরবর্তীতে এই সমস্ত দলগুলি শ্রেণীর অভ্যন্তরীন সংকটের কারণে শ্রেণীগত ভাবে বিভক্ত হয়ে পড়ছে।[১] এই সংকটের প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই উৎপাদক শ্রেণীর সংগে অনুৎপাদকশ্রেণীর কিংবা শিল্প পুঁজির সংগে ব্যবসায়ী পুঁজির। এই সংকেটর আবর্তে এসে এদেশের রাজনীতি হয়ে পড়েছে কর্মসূচীহীন, সিদ্ধান্তহীন, অস্থির ও অস্থিতিশীল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক দলগুলো একদিকে যেমন ক্রমাগত ভাংগনের সম্মুখীন হচ্ছে অপর দিকে তেমনি ব্যাপক জনগণ থেকে দূরে সরে পড়ছে।

(৫) উপদলীয় কোন্দল সৃষ্টি এবং দলভাংগনের অন্যতম কারণ হোল রাজনৈতিক দল সমূহের প্রকাশ্য রাজনৈতিক কার্যক্রমের ধারাবাহিকতার অভাব। কিন্তু দলীয় ব্যবস্থার যথাযথ বিকাশের জন্য প্রকাশ্য রাজনৈতিক কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা তথা গণতান্ত্রিক পরিবেশ অপরিহার্য। বাস্তবে বাংলাদেশে এই পরিবেশের যথেষ্ট অভাব পরিলক্ষিত হয়। স্বল্প সময়ের ব্যবধানে এখানে সামরিক শাসন জারী হওয়ায় রাজনৈতিক দলগুলি তাদের কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে বাধার সম্মুখীন হয়। উপরন্তু সামরিক সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই সমস্ত রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ ঘোষনা করেন এবং একই সংগে দীর্ঘ সময়ের জন্য দলীয় কার্যকলাপের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। রাজনৈতিক তৎপরতা বন্ধ থাকার কারণে দলের অভ্যন্তরীন কলহ ও কোন্দল তীব্রতর ও প্রকট হয়। বস্তুতঃ এ কারণেই দেখা গেছে সামরিক শাসন উঠে যাবার পর শুরু হয় দল ভাংগা।

১৯৭৫ সনের সামরিক অভ্যুত্থানের পর থেকে বিশ কিছু দিন রাজনৈতিক দলগুলোর উপর নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকে। ১৯৭৬ সনের ২৮শে জুলাই প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক 'রাজনৈতিক দলবিধি '৭৬' জারী করেন। রাজনৈতিক দলবিধির শর্তমালা পূরণ করে ১৯৭৬ সনের নভেম্বর পর্যন্ত ৫৬টি দল অনুমোদনের আবেদন করে অনুমোদন লাভের জন্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও

---

১। 'বিচিত্রা' ৭ বর্ষ, ২৬ সংখ্যা, ১ ডিসেম্বর, ১৯৮৪।

Dhaka University Institutional Repository



এবং এর মধ্যে রাজনীতি করবার অনুমোদন পায় ২১ টি দল । কিন্তু এই সময় দেশের সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের ভিতর ভাংগন দেখা দেয় ।

১৯৭৬ সনে সংসদীয় ও নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে জেনারেল ওসমানী গঠন করেন ' জাতীয় জনতা পার্টি ' ।

এ ছাড়া আওয়ামী লীগ থেকে বের হয়ে এসে ১৮৭৬ সনে মওলানা তর্কবাগীশ গঠন করেন 'গণ আজাদী লীগ' । ১৯৭৮ সনে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় এ দল বিভক্ত হয়ে পড়ে ।

আওয়ামী লীগ থেকে বের হয়ে '৭৬ সনে খন্দকার মোশতাক আহমদ ' বাংলাদেশ ডেমোক্রেটিক লীগ' নামে একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করেন । ১৯৮০ সনে মোশতাকের সাথে দলের সাধারণ সম্পাদক শাহ মোয়াজ্জেম হোসেনের বিরোধ বেঁধে উঠলে গণতান্ত্রিক দল বিভক্ত হয়ে পড়ে । ইতিপূর্বে আওয়ামী লীগ থেকে শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন খন্দকার মোশতাকের নেতৃত্বে ১৯৭৬ সনে বের হয়ে এসেছিলেন । কিন্তু ১৯৮০ সনে ডেমোক্রেটিক লীগ থেকে বেরিয়ে এসে শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন দুই বছর পর অর্থাৎ ১৯৮২ জনদলে যোগদান করেন অতঃপর জাতীয় ফ্রন্টের মাধ্যমে এরশাদের জাতীয় পার্টিতে যোগদেন । অধ্যাবদি তিনি এরশাদের মন্ত্রী সভায় উপ-প্রধান মন্ত্রীর দায়িত্ব ভার পালন করছেন ।[১০]

এই প্রসংগে আরেকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যায় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল থেকে । প্রতিষ্ঠাকাল থেকে বি,এন,পি,-তে উপদলীয় বিরোধ বিরাজমান থাকলেও জিয়াউর রহমানের জীবন কালে দলে কোনরূপ ভাংগন আসে নাই । ১৯৮১ সনের ৩০শে মে জিয়ার মৃত্যুর পর থেকে '৮২ সালের ২৪শে মার্চ সামরিক আইন জারীর পূর্ব পর্যন্ত বি,এন,পি, যতদিন ক্ষমতায় ছিল ততদিন পর্যন্ত দলে প্রকাশ্য ভাংগন দেখা দেয় নাই । কিন্তু ১৯৮৩ সনে ঘরোয়া রাজনীতি শুরুর মুহূর্তেই দলটি বিভক্ত হয় । ১৯৮৩ সালের ২রা এপ্রিল শামসুল হুদাকে চেয়ারম্যান এবং ডাঃ মতিনকে মহাসচিব ঘোষনা দিয়ে বি,এন,পি,-তে প্রথম ভাংগন আনায়ন করা হয় । কিন্তু এর কিছুদিন পরেই বি,এন,পি, (হুদা) গ্রুপে পুনরায় ভাংগন দেখা দেয়। সাইদ এমদাদ গ্রুপ, দুদু-নীলু গ্রুপ, হুদা গ্রুপ থেকে বের হয়ে এসে পৃথক বি,এন,পি, গঠন করেন । অর্থাৎ এই সময় বি,এন,পি, বেশ কয়েকবার ভাংগনের পর এইরূপ ধারন করে । যেমনঃ বি,এন,পি, (সাত্তার), বি,এন,পি,(হুদা-মতিন), বি,এন,পি, (সাইদ-এমদাদ) এবং বি,এন,পি, (হুদা-নীলু)। যদিও পরে নীলু হুদা পৃথক বি,এন,পি, গঠন করেন ।[১১]

---

১০। ৩১শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮৮ সনে জাতীয় পার্টির কার্য্যালয়ের শাহ মোয়াজ্জেম হোসেনের সংগে গৃহীত সাক্ষাৎকার ।

Dhaka University Institutional Repository



পরবর্তীতে হুদা-মতিন গ্রুপের দলের বিলুপ্তি ঘটিয়ে জনদলে যোগদেন এবং এরশাদের জাতীয় পার্টিতে যোগ দিয়ে মন্ত্রীত্ব গঠন করেন।

(৬) বিরাজমান পরিস্থিতিতে দলের আদর্শ, নীতি বা কর্মসূচী নির্ধারনে মতপার্থক্য ও দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হবার কারণেও বাংলাদেশে বেশ কয়েকটি করা নৈতিক দলে বিভিন্ন সময়ে ভাংগন সৃষ্টি হয়েছে। মূলতঃ বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর ক্ষেত্রে একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

সত্তর দশকে বিশেষতঃ পঁচাত্তর এর পর ভাসানী ন্যাপের অভ্যন্তরীণ কোন্দল মারাত্মক আকার ধারন করে। ভাসানীর মৃত্যুর পর নেতৃত্ববিহীন দলটি উপদলীয় কোন্দল বিরোধ ও দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয়। দলের নীতি নির্ধারন, কর্মসূচী গ্রহণ, দলের অভ্যন্তরে পদ ও নেতৃত্ব লাভের আকাঙ্খা এই দলে বারবার ভাংগন আনে। এমনকি মূলদল থেকে বেরিয়ে আসা সৃষ্টি নতুন দলেও ভাংগন দেখা দেয়। মওলানা ভাসানী নিজেই জীবনের শেষপ্রান্তে এসে গঠন করেন।'খোদাই খিদমত গার' নামে একটি ধর্মীয় সংগঠন। অপরদিকে ন্যাপের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ডঃ আলীম আল রাজী পৃথক দল পিপলস্ লীগ গঠন করেন। পরে পিপলস্ লীগ দু'ভাগে ভাগ হয়ে পড়ে। একটির নেতৃত্ব দেন আলীম আল রাজী এবং অপরটির গরীব নেওয়াজ। এদিকে ন্যাপ আরও দুভাগে ভাগ হয়। একদিকে মশিয়ুর রহমান ও এস,এ, বারী এটি এবং অন্যদিকে আবু নাসের খান ভাসানী ওগাজী শহিদুল্লাহ। অতঃপর মশিয়ুর রহমান তাঁর ন্যাপের বিলুপ্তি ঘটিয়ে বারীসহ জিয়ার দলে যোগদেন এবং উভয়ই মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করেন। অপরদিকে গাজী-নাসের নেতৃত্বাধীন ন্যাপ আবার দুভাগে ভাগ হয়ে পড়ে। একদিকে থাকেন গাজী অন্যদিকে নাসের ভাসানী। নাসের পরবর্তীতে কিছু সময়ের জন্য এরশাদের ক্যাবিনেটেও যোগদেন। আবার মশিয়ুর বারী নেতৃত্বের সাথে বিরোধ হওয়ায় নুরুর রহমান ও আনোয়ার জাহিদের নেতৃত্বে ন্যাপ (নুরু-জাহিদ) আব্দুল খালেক ও এম, আলী আশরাফের নেতৃত্বে ন্যাপ (খালেক) এবং সেলিনা মজুমদারের নেতৃত্বে ন্যাপ (সেলিনা) গড়ে উঠে।

আনোয়ার জাহিদ পরে তার দলের বিলুপ্তি ঘটিয়ে এরশাদের ক্যাবিনেটে যোগদান করে মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করেন।[১২]

---

১২। ১৯৮৩ সনে জনদলে প্রথমে যোগদান করেন। পরে জাতীয় ফ্রন্টে এবং ১৯৮৯ তে জাতীয় পার্টিতে আসেন। তিনি ১৯৮৭ সনে মন্ত্রীত্ব থেকে পদত্যাগ করেন।

Dhaka University Institutional Repository


(৭) বাংলাদেশের রাজনীতি গভীরভাবে ক্যারিজমা দ্বারা প্রভাবিত । এর ফলে বাংলাদেশের রাজনীতি একটি পৃথক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে উঠতে পারছেনা । ক্যারিজমাটিক নেতা হিসেবে আমরা শেখ মুজিবর রহমানের নাম উল্লেখ করতে পারি । তাঁর প্রভাবেই আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন দল হিসেবে সকল প্রকার কর্মসূচী এবং সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে । ফলে তাঁর এই প্রচন্ড প্রভাবের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা দলীয় কর্মীদের জন্য প্রধান দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায় ।[১৩] ১৮৭২ থেকে '৭৫ সনের মধ্যে আওয়ামীলীগ কোন্দলের মধ্যে তাজউদ্দীন আহমদ গ্রুপ সৈয়দ নজরুল গ্রুপের কোন্দল, মিজানুর রহমানের উপদলীয় কার্যকলাপ এবং আবদুর রাজ্জাক তোফায়েল আহমদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল উল্লেখযোগ্য । আওয়ামী লীগেরএই সময়ে কোন্দল শেখ মুজিব জীবিত থাকাকালীন সময় পর্যন্ত দলে কোন ভাংগন আনতে পারেনাই । কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর কয়েক বৎসরের মধ্যে দলে বেশ কয়েকটি ভাংগন পরিলক্ষিত হয় । যেমন - খন্দকার মোশতাকের 'ডেমোক্রেটিক লীগ' মওলানা তর্কবাগীসের 'গণ আজাদী লীগ' মিজানুর রহমান চৌধুরীর আওয়ামী লীগ (মিজান) এবং আব্দুর রাজ্জাকের বাকশাল ।

আলোচনার সবশেষে আমি বলতে চাই বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলের ভাংগন এত মাত্রাতিরিক্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে যে আমাদের রাজনীতিতে আজ এক অস্থিতিশীল অবস্থা বিরাজ করছে । উপরন্তু উপদলীয় কোন্দলের মনোভাব প্রতিনিয়তই দলের একতা, সংহতি ও ঐক্যের বিরুদ্ধে হুমকী স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে । এর ফলে আমাদের জাতীয় পর্যায়ের সকল প্রকার উন্নয়নমূলক কর্ম প্রচেষ্টা একদিকে যেমন কার্য-অক্ষম ( Dysfunctional ) হয়ে পড়ছে অপরদিকে তেমনি আমাদের গণতন্ত্রের বিকাশ ব্যাহত হচ্ছে । একই সংগে বিঘ্নিত হচ্ছে রাজনৈতিক উন্নয়নের গতি । সুতরাং আজ এটা স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয়ে পড়েছে যে এই অবস্থার যত তাড়াতাড়ি সমাধান করা যাবে ততই বাংলাদেশের জন্য তা মংগলকর হবে ।

---

১৩। মওদুদ আহমদ, 'বাংলাদেশ : শেখমুজিবর রহমানের শাসনকাল, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, প্রথম বাংলা সংস্করণ, নভেম্বর ১৯৮৭, পৃ : ৩৬১ ।

॥ ১৯৪৯ – [illegible] আওয়ামী লীগ ॥

Dhaka University Institutional Repository

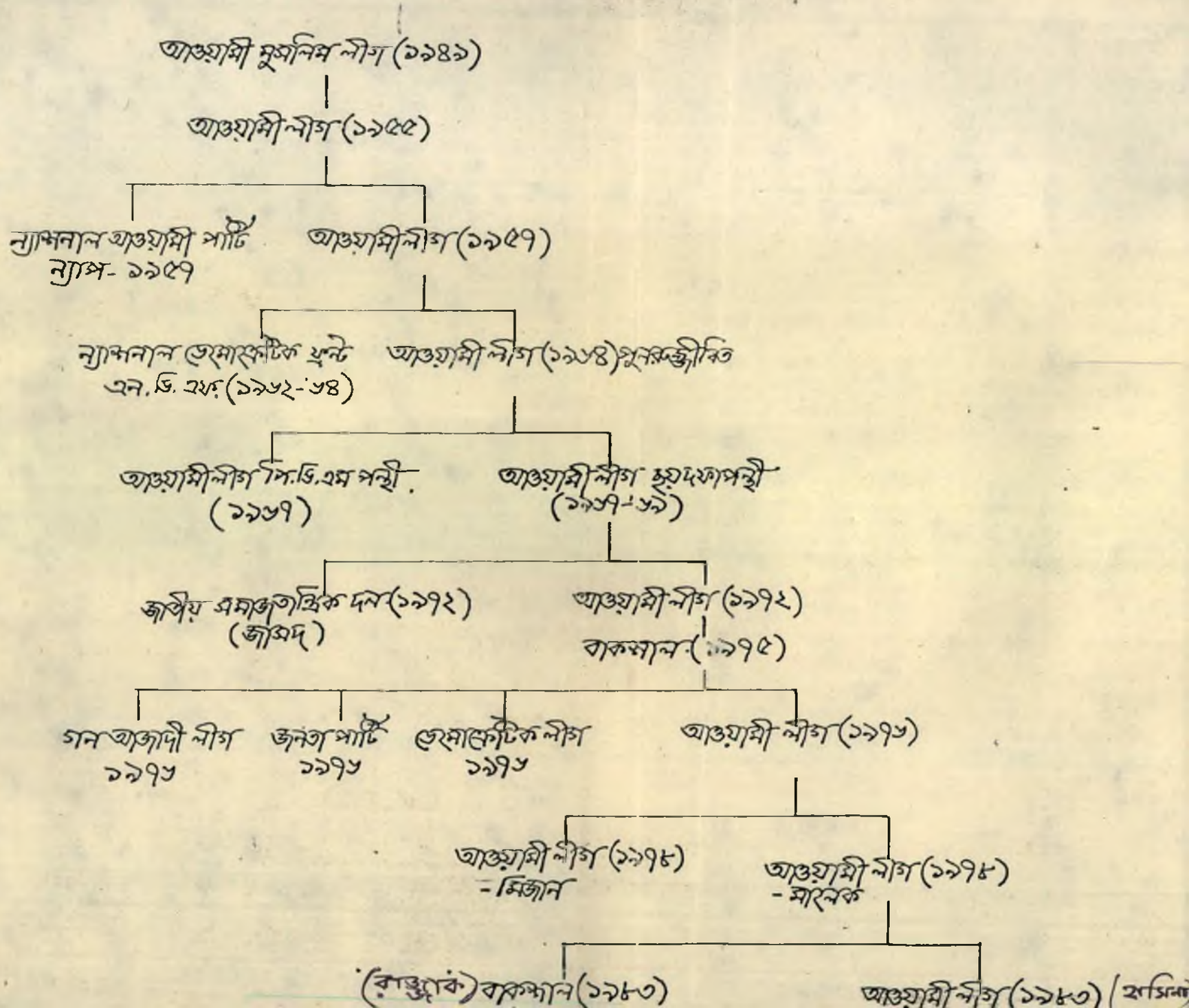

Dhaka University Institutional Repository


## গ্রন্থপঞ্জী


১. Joseph La Palombara and Myron Weiner - Political Parties and Political Development, Princeton, New Jersey, Princeton University Press, 1966.

২. Samuel J. Eldersveld - Political Parties - A Behavioral Analysis, Rand Menalby and Company, Chicago, 1964.

৩. Richard Hofstadter - The idea of a Party System, University of California Press, 1970.

৪. Maurice Duverger - Political Parties, London, Methuen and Co. Ltd., First Published 1951.

৫. Sigmund Neumann - Modern Political Parties, The University of Chicago Press, 1956.

৬. Betty B. Burch and Allan B. Cole - Asian Political System, D. Van Nostrand Company, 1968.

৭. Angela S. Burger - Opposition in a Dominant Party System, The Center for South and South East Asia Studies, University of California Press, Los Angeles, 1969.

৮. Robert R. Alford - Party and Society, Rand Menally, Chicago, 1963.

৯. M.M. Drucker - The Multi Party Britain, University of Edinburgh, 1962.

১০. F.G. Bailey - Politics and Social Change, Oxford University Press, 1963.

১১. Ernert Barker - Reflections on Government, Oxford University Press, F. P. May 1942.

১২. Gubriel A. Almond - Comparative Politics Today, Little Brown and Comany, 1974.

Dhaka University Institutional Repository

১৩. G. David Garson - Group Theories in Politics, Vol.6, Sage Publication, Beverly Hills, London, 1960.

১৪. R.M. MacIver - The Web of Government, The Free Press, A Division of Macmillan Publishing Company, New York, 1965.

১৫. Lusian W. Pye - Communications and Political Development, Princeton University Press, 1967.

১৬. Richard L.Cole - Introduction to Political inquiry. Macmillan Publishing Company, New York, 1980.

১৭. Almond and Powell - Comparative Politics : System, Process and Policy, Little Brown and Company, 1978.

১৮. Almond and Coleman - The Politics of the developing areas, Princeton, New Jersey, Princeton University Press, 1960.

১৯. David E. Apter - The Politics of Modernization, The University of Chicago Press, Chicago and London, 1965.

২০. David Easton - A Systems Analysis of Political Life, John Wiley and Sons, New York, 1965.

২১. Maurice Duverger - The Idea of Politics : The Uses of Power in Society. University Paper Back, 1966.

২২. G.C. Field - Political Theory. Methuen and Company Ltd.,1956.

২৩. Harold D. Lasswell - The Analysis of Political Behaviour : An Empirical Approach, Routledge and Eagan Paul Ltd., London, 1948.

২৪. Edited by H. Ebstein and David E. Apter - Comparative Politics, The Free Press, New York, 1963.

Dhaka University Institutional Repository



২৫. R.M. MacIver - The Modern State, The Free Press, A Division of MaCmillan Publishing Company, New York, 1926.

২৬. David E. Apter - Introduction to Political Analysis, Princeton Hall of India Press Ltd., New Delhi, 1981.

২৭. Golam Hossain - General Ziaur Rahman and the B.N.P., University Press Limited, Dhaka, F.P. 1988.

২৮. Md. Asghar Khan - Generals in Politics 1958-82, Vikas Publishing House Pvt. Ltd., New Delhi, 1983.

২৯. Mohammed Yunus - Persons, Passions and Politics, Vikas Publishing House Pvt. Ltd., Delhi, 1980.

৩০. Khalid Bin Sayeed - Politics in Pakistan - The Nature and Directions of Change, Pareger Publisher, New York, 1980.

৩১. Talukder Muniruzzaman - Military withdrawal from Politics - A comparative study, Bukinger Publishing Company, Cambridge, 1988.

৩২. Kamruddin Ahmed - A Social History of Bengal, Progoti Publishers, Dhaka, 19

৩৩. Jyoti Sen Gupta - History of Freedom Movement in Bangladesh 1947 - 1973, Naya Prokash, Calcutta, 1974.

৩৪. Mustaq Ahmed - Government and Politics in Pakistan, Pakistan Publishing House, Karachi, 1954.

৩৫. M. Ayoob and K. Subrahmanyam - The Liberation War, S.Chand and Company Pvt. Ltd., Ram Nagar, Delhi, 1972.

৩৬. Emajuddin Ahmed ed. - Bangladesh Politics, Centre for Social Studies, Dhaka, 1980.

Dhaka University Institutional Repository



৩৭. M.G. Kabir - Minority Politics in Bangladesh. Vikas Publishing House Pvt. Ltd., Delhi - 1980.

৩৮. A.M.A. Muhith - Bangladesh Emergence of a Nation, Bangladesh Books International, Dhaka, 1978.

৩৯. A.L. Khatib - Who Killed Mujib ? Vikas Publishing House Pvt. Ltd., Delhi, 1981.

৪০. Talukder Muniruzzaman - Group Interested and Political Changes. New Delhi, Madras, South Asia Publishers, 1982.

৪১. K. Ali - Bangladesh, A New Nation, Ali Publication, Dhaka,1982.

৪২. Tariq Ali - Pakistan : Military Rule or Peoples Power, Vikas Publications Pvt. Ltd., Delhi, 1970.

৪৩. Emajuddin Ahmed - Bureaucratic Elites in Segmented Economic Growth : Bangladesh and Pakistan - University Press Limited, Dhaka, 1980.

৪৪. Rounaq Jahan - Pakistan : Failure in National Integration. Columbia University Press, New York, 1972.

৪৫. K.B. Sayed - The Political System of Pakistan, Boston, Haughton Mifflin, 1967.

৪৬. Zillur Rahman Khan - Martial Law to Martial Law Leadership Crisis in Bangladesh University Press Limited, Dhaka, 1984.

৪৭. Talukder Muniruzzaman - The Politics of Development : The Case of Pakistan (1947 - 1958). Green Book House Limited, Dhaka, 1971.

৪৮. Rounaq Jahan - Bangladesh Politics : Problems and Issues. University Press Limited, Dhaka, 1980.

*Dhaka University Institutional Repository*




৪৯। M.A. Wadud Bhuiyan - Emergence of Bangladesh and Role of Awami League. Vikas Publishing House Pvt. Ltd., Delhi, 1982.

৫০. Zillur Rahman Khan and A.T.R. Rahman - Provincial Autonomy and Constitution Making - The Case of Bangladesh. Green Book HouseLimited, Dhaka, 1973.

৫১. Talukder Muniruzzaman - The Bangladesh Revolution and its aftermath. Bangladesh Books International, Dhaka, 1980.

৫২. Moudud Ahmed - Bangladesh : Constitutional Quest for Autonomy. University Press Limited, Dacca, F.P. 1976.

৫৩. Shamsul Huda Harun - Parliamentary Behavior in A Multi National State 1947 - 58 Bangladesh Experience. Asiatic Society of Bangladesh, August 1984.

৫৪. Md. H.R. Talukder ed. - Memoirs of Huseyn Shaheed Suhrawardy with a brief account of his life and work. The University Press Limited, Dhaka, F.P. 1987.

৫৫. Moudud Ahmed - 'Bangladesh : Era of Sheikh Mujibur Rahman'. University Press Limited, F.P. November, 1983.

৫৬. M. Rafique Afzal - Political Parties in Pakistan, 1947-58. Islamabad, 1976.

৫৭. অলি আহাদ - জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে '৭৫, বর্ণ[illegible] মুদ্রায়ন, ঢাকা, ১৯৭৮ ।

৫৮. বদরুদ্দীন উমর - পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি- প্রথম খন্ড, মাওলা ব্রাদার্স, বাংলা বাজার, ঢাকা, ১৯৭৯, ২য় সংস্করণ ।

৫৯. এম, আর, আখতার মুকুল- আমি বিজয় দেখেছি, সাগর পাবলিশার্স, ঢাকা ১৯৮৪ ।

৬০। শাহ আহমদ রেজা- ভাসানীর কাগমারী সম্মেলন স্বায়ত্তশাসনের সংগ্রাম, [illegible], ঢাকা, ১৯৮৬ ।

Dhaka University Institutional Repository



৬১. তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া - পাকিস্তানী রাজনীতির ২০ বছর, নিউ নেশন, ঢাকা, ১৯৮১ ।

৬২. আহমেদ মুসা- ইতিহাসের কাঠগড়ায় আওয়ামী লীগ, বুক প্রমোশন প্রেস, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৮ ।

৬৩. বদরুদ্দীন উমর- বাংলাদেশে কমিউনিষ্ট আন্দোলনের সমস্যা, মুক্তধারা, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর, ১৯৭৫ ।

৬৪. বদরুদ্দীন উমর, - যুদ্ধপূর্ব বাংলাদেশ, মুক্তধারা, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর, ১৯৭৬ ।

৬৫. ফয়েজ আহমদ- বিবিধ ভাবনা, অনিন্দ্য প্রকাশনা, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৭ ।

৬৬. মোশাররফ হোসেন - বাংলাদেশের সমাজ ও সামরিক শাসন, নাবা প্রিন্টার্স, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৮ ।

৬৭. সিরাজুর রহমান - বি,বি,সির দৃষ্টিতে বাংলাদেশে স্বাধীনতার পনের বছর, সিরাজুর রহমান, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৭ ।

৬৮. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী - আশির দশকে বাংলাদেশের সমাজ, ডানা প্রকাশনী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৫ ।

৬৯. মুহাম্মদ জাহাংগীর সম্পাদিত - জাতীয়তাবাদ বিতর্ক, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৭ ।

৭০. আবদুল হক - ভাষা আন্দোলনের আদিপর্ব, মুক্তধারা, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬ ।

৭১. আসহাবুর রহমান সম্পাদিত - বাংলাদেশের ভবিষ্যত ও অন্যান্য প্রবন্ধ, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৮৭ ।

৭২. আলী রীয়াজ - শেখ মুজিব ও অন্যান্য প্রসংগ, আনন্দধারা, ঢাকা, জুলাই ১৯৮৭ ।

৭৩. হায়াত হোসেন - বাংলাদেশও গণতন্ত্রের সংকট, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, চট্টগ্রাম, মে, ১৯৮৫ ।

৭৪. সহুরুল ইসলাম- স্বাধীনতা ভাসানী ভারত, অয়ন প্রকাশনা, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী ১৯৮৭ ।

Dhaka University Institutional Repository



৭৫. সাইফ-উদ-দাহার- রাষ্ট্র ভাষা থেকে স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং তারপর, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, নভেম্বর ১৯৮৬ ।

৭৬. কাজী শামসুজ্জামান- আমরা স্বাধীন হলাম, মুক্তধারা, এপ্রিল, ১৯৮৫ ।

৭৭. বদরুদ্দীন উমর- বাংলাদেশে আর্থ সামাজিক পরিবর্তনের ধারা, বর্ণবিচিত্রা প্রকাশনী, ঢাকা, সেপ্টেম্বর, ১৯৮৭ ।

৭৮. কৃত্তিবাস ওঝা- আমি মুজিব বলছি, নওরোজ কিতাবিস্তান, বাংলা বাজার, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭২ ।

৭৯. গাজীউল হক- এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, প্রথিঘর প্রকাশনী, বাংলা বাজার, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ভাদ্র, ১৩৭৮ ।

৮০. আবুল মনসুর আহমদ - আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭০ ।

৮১. মওদুদ আহমদ- বাংলাদেশ : শেখ মুজিবর রহমানের শাসনকাল, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ বাংলা সংস্করণ, ১৯৮৭ ।

## প্রবন্ধ ও দলিল পত্র

১. M. Rashiduzzaman- The National Awami Party of Pakistan, leftist Politics in crisis in Pacific Affairs. An International review of Asia and pacific, university of Calefirnia Press, Vol-XL,111, No. 3, Feb. 1970.

2. Rounaq Jahan- Bangladesh in 1973. Management of Factional Politics, Asian survey, Vol-XIV, No. 2.Feb. 1974.

৩. Talukder Muniruzzaman-Bangladesh:An unfinished Revolution in Emajuddin Ahmed ed. Bangladesh politics, Dhaka, Centre for social Studies, 1980.

৪. Draft constitution and Rules of the East Pakistan Awami League 1949.

Dhaka University Institutional Repository



৫. Abul Fazl Huq- Constitution Making in Bangladesh. in Bangladesh politics ed. by Emajuddin Ahmed, social studies Centre, 1980.

৬. National Awami Party: Constitution and Rules, Dhaka 1957.

৭. সম্পাদক : হাসান হাফিজুর রহমান, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিল পত্র প্রথম খন্ড ১৯৮২ ।

৮. মওলানা ভাসানীর ভাষন সম্বলিত পুস্তিকা , ১৯৫৭, নিখিল পাকিস্তান গণতান্ত্রিক কর্মী সম্মেলন, ২৫-২৬ জুলাই, ১৯৫৭ ।

৯. পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ,'আমাদের বাঁচার দাবী ও দফা কর্মসূচী', ৫১ পুরানা পল্টন, ঢাকা, ১৯৬৬ ।

১০. বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, গঠনতন্ত্র ও ঘোষনা পত্র, ২৩ বংগবন্ধু এভিনিউ ১৯৮৭ ।

১১. রেজওয়ান সিদ্দিকী - 'ভাংগা গড়ার রাজনীতি', সাপ্তাহিক বিচিত্রা-৭ম বর্ষ,২৬ সংখ্যা, ১লা ডিসেম্বর,১৯৭৮ ।

১২. আমেনা বেগম- 'আমার কথা, বিচিত্রা, ১৫ই জুলাই ১৯৮৭ ।

১৩. শাহ আহমদ রেজা- 'আওয়ামী লীগের ৩৭ বছর', বিচিত্রা, ১৫ বর্ষ,২৯ সংখ্যা, ২৬শে ডিসেম্বর,১৯৮৬ ।

১৪. সামরিক আইনজারী ও জেনারেল ঈর্ষা কর্তৃক ক্ষমতা দখল সূত্র: সরকারী দলিল , তারিখ ৭ই অক্টোবর,১৯৫৮ ।

১৫. মওলানা ভাসানী প্রদত্ত ভাষনের কিছু অংশ, প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা, ১৯শে মার্চ,১৯৪৮, তথ্য মন্ত্রণালয়ে প্রকাশিত ।

সাময়িকী ও পত্রপত্রিকা

১. বিচিত্রা, ৫ম বর্ষ, ২১ সংখ্যা, ২২ অক্টোবর, ১৯৭৬ ।

২. বিচিত্রা, ৭ম বর্ষ, ২৬ সংখ্যা, ১লা ডিসেম্বর, ১৯৭৮ ।

৩. বিচিত্রা, ৭ম বর্ষ, ৩০ সংখ্যা , ১৯ ডিসেম্বর,১৯৭৮ ।

Dhaka University Institutional Repository



৪. বিচিত্রা, ৮ম বর্ষ, ২২ সংখ্যা, ৭ অক্টোবর, ১৯৭৮ ।

৫. বিচিত্রা, ৮ম বর্ষ, ৩০ সংখ্যা, ২৯শে ডিসেম্বর, ১৯৭৮ ।

৬. বিচিত্রা, ৭ম বর্ষ, ২৬ সংখ্যা, ১ লা ডিসেম্বর ১৯৮৪ ।

৭. রোববার, ৬ বর্ষ, ১৬ সংখ্যা, ১১ ডিসেম্বর, ১৯৮৩ ।

৮. রোববার, ৬ বর্ষ, ১৩ সংখ্যা, ২০ ডিসেম্বর, ১৯৮০ ।

৯. রোববার, ৩ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৮০ ।

১০. রোববার, ৩ বর্ষ, ৩৪ সংখ্যা, ১৯ এপ্রিল, ১৯৮১ ।

১১. ইত্তেফাক- ২০ জুলাই, ১৯৪৮ ।

১২. দৈনিক আজাদ- ফেব্রুয়ারী- ২১-২৮,১৯৫২ ।

১৩. সাপ্তাহিক নওবেলাল- মার্চ ৪, ১৯৪৮ ।

১৪. পাকিস্তান অবজারভার, ২৮ অক্টোবর, ১৯৬২ ।

১৫. ডন- ২ ডিসেম্বর, ১৯৫৬ ।

১৬. দৈনিক সংবাদ- ৬ ও ৮ ফেব্রুয়ারী , ১৯৫৭ ।

১৭. দৈনিক সংবাদ- ২৬ জুলাই, ১৯৫৭ ।

১৮. দৈনিক বাংলা- ২রা এপ্রিল, ১৯৭২ ।

১৯. দৈনিক ইত্তেফাক- ১০ জানুয়ারী, ১৯৮২ ।

২০. দৈনিক ইত্তেফাক, ২১ জুন, ১৯৮৩ ।

২১. দৈনিক ইত্তেফাক, ১১ নভেম্বর, ১৯৮৩ ।

২২. Bangladesh Today, 11th November, 1983.

২৩. The Bangladesh Observer, Novembor 5, 1972.

২৪ স Dainik Bangla, Dhaka, October 21.1972.

২৫. Dainik Bagla, October 21, 1972.

২৬. Gonokantha, 9 January 1974.

২৭. The Bangladesh Observer, 18 March,1974.

২৮. Banglar Bani, 1 April 1974.

২৯. Holiday, December 5, 1981.

৩০. Holiday, September 21, 1980.